

# চাঁদের শাহাড

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



# টাদের পাহাড়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

## দাম—এক টাকা আট আনা

---

কলিকাতা ১৪ কলেজ স্টোরার এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ হইতে শ্রীঅপূর্বকুমার  
বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, হিন্দুস্থান প্রেস হইতে  
ত্রিফণিভূষণ বসু রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

টাদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপত্যাসের অনুবাদ নয় বা ঐ শ্রেণীর কোনও বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বই-এর গল্প ও চরিত্রগুলি আমার কল্পনা-প্রসূত। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাকে প্রকৃত অবস্থার অনুযায়ী করবার জন্যে আমি স্যার এইচ্. এইচ্. জন্স্টন (Sir Harry Johnston) Rosita Forbes প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত ভ্রমণকারীর পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এই গল্পে উল্লিখিত রিক্টাবস্ভেল্ড পর্বতমালা পশ্চিম মধ্য আফ্রিকার অতি প্রসিদ্ধ পর্বতশ্রেণী এবং ডিস্কোনেক (Rhodesian mouster) ও বুনিপেব প্রবাদ জুলুল্যাণ্ডের বহু আরণ্য-অঞ্চলে আজও প্রচলিত।

সেন্ট ফ্র্যাঙ্কো সৌর স্তোত্রের অনুবাদটী স্বর্গীয় মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত।

শিল্পী শ্রীযুক্ত বিনয় বসু এই পুস্তকের প্রচ্ছদপদ ও ছবিগুলি অঁকিয়া আমাকে রুতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বাব্বাকপুত্র, যশোহর }  
১লা আশ্বিন, ১৩৪৪

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



## ଥୁକୁକେ ଦିଲାଖ

ନାବାକପୁର, ଯଶୋହର  
୧ମୀ ଆଦିନ, ୧୯୫୫

}

ଶ୍ରୀବିଭୂତିଭୂଷଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ









ভিক্রোনেক ! ভিক্রোনেক !! পালাও, পালাও সাহেব !

# চাঁদের পাহাড়

এক

শঙ্কর একেবারে অজ পাড়গাঁয়ের ছেলে। এইবার সে সবে এফ্‌, এ পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেচে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, ছুপুরে আহা রাস্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া। সারা বৈশাখ এভাবে কাটবার পরে একদিন তার মা ডেকে বলেন—শোন একটা কথা বলি শঙ্কর। তোর বাবার শরীর ভাল নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনো হবে কি করে? কে খরচ দেবে? এইবার একটা কিছু কাজের চেষ্টা দাখ্‌।

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাবিয়ে তুললে। সত্যিই তার বাবার শরীর আজ ক'মাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে। কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। অথচ করবেই বা কি শঙ্কর? এখন কি তাকে কেউ চাকুরী দেবে? চেনেই বা সে কাকে?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরী। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকুরীর বাজার এতটা খারাপ ছিল না। শঙ্করদের গ্রামের এক

ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটীতে পাটের কলে চাকুরী করতেন। শঙ্করের মা তাঁর জীকে ছেলের চাকুরীর কথা বলে এলেন। যাতে তিনি স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্মে পাটের কলে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরদিন বাড়ী বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকুরীর জন্মে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয়। স্কুলে পড়বার সময় সে বরাবর খেলাধুলোতে প্রথম হয়ে এসেচে। সেবার মহকুমার এক্জিভিসনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে মেডেল পায়। ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জুড়ি খুঁজে মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিংএ সে অত্যন্ত নিপুণ। কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই, এম, সি, এ'তে সে রীতিমত বক্সিং অভ্যাস করেছে। এই সব কারণে পরীক্ষায় সে তত ভাল করতে পারে নি, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তার একটা বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ খাঁটা ও বড় বড় ভূগোলের বই পড়া। ভূগোলের অঙ্ক কসতে সে খুব মজবুত। আমাদের দেশের আকাশে যে সব নক্ষত্র মণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে—ওটা কালপুরুষ, ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া, ওটা বৃশ্চিক, কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোনদিকে ওঠে—ওর সব নখ-

দর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখনি বলে দেবে। আমাদের দেশের বেশী ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সে একরাশ ওই সব বই কিনে এনেছে, নিৰ্জ্জনে বসে প্রায়ই পড়ে আর কি ভাবে ওই জানে। তারপর এল তার বাবার অমুখ, সংসারের দারিদ্র্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে চাকুরী নেওয়ার জন্তে অনুরোধ। কি করবে সে? সে নিতান্ত নিরুপায়। মা-বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না। অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকুরী নিতে হবে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তাহোলে ভেঙ্গে যাবে, তাও সে যে না বোঝে এমন নয়। ফুটবলের নাম করা সেন্টার ফরওয়ার্ড, জেলার হাই জাম্প চ্যাম্পিয়ন, নাম-জাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কিনা শেষে পাটের কলের বাবু? নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ুন পকেটে ক'রে তাকে সকালের ভেঁা বাজতেই ছুটতে হবে কলে—আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা—ওদিকে সেই ছ'টার ভেঁা বাজলে ছুটী। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—রেসের ঘোড়া শেষ কালে ছ্যাকড়া গাড়ী টানতে যাবে? সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই। নদীর ধারে নিৰ্জ্জনে বসে বসে শঙ্কর এই সব কথাই ভাবছিল। তার মন

উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে শত হুঃসাহসিক  
কাজের মাঝখানে। লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলির মত, হ্যারি  
জনস্টন, মার্কো পোলো, রবিনসন ক্রুসোর মত। এর জন্মে  
ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে—যদিও এ কথা  
ভেবে দেখেনি অন্টাড়োর ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে,  
বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা এক রকম অসম্ভব। তারা  
তৈরী হয়েছে কেরানী, স্কুলমাষ্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার  
জন্মে। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাতপথে পাড়ি দেওয়ার আশা  
তাদের পক্ষে নিতান্তই ছরাশা।

প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েষ্টমার্কের  
বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার  
একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ  
জার্মান ভূপরিচিতি আন্টন হাউপ্টম্যান লিখিত আফ্রিকার একটা  
বড় পর্বত—মাউন্টেন অফ্ দি মুন্ ( চাঁদের পাহাড় )  
আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কত বার সে এটা পড়েছে।  
পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের্ হাউপ্টম্যানের মত সেও  
একদিন যাবে মাউন্টেন অফ্ দি মুন্ জয় করতে। স্বপ্ন! সত্যিকার  
চাঁদের সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতই দূরের জিনিস হয়ে  
চিরকাল।.....চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে ?

সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে।.....

চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতীর দল মড়্ মড়্  
করে বাঁশ ভাঙছে। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে একটা

প্রকাণ্ড পর্বতে উঠেচে ; চারি ধারের দৃশ্য ঠিক হাউপ্টম্যানের লেখা মাউন্টেন্‌ অফ্‌ দি মুনের দৃশ্যের মত। সেই ঘন বাঁশ-বন, সেই পরগাছা বোলানো বড় বড় গাছ, নীচে পচাপাতার রাশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা—আব দূরে গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাদা ধ্বংসে চিরতুষ্মারে ঢাকা পর্বত শিখরটী—এক এক বার দেখা যাচ্ছে, এক একবার বনের আড়ালে চাপা পড়চে। পরিষ্কার আকাশে ছ একটা তারা এখানে ওখানে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতীর গর্জন শুনতে পেলো...সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল...এত বাস্তব বলে মনে হোল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার উপর উঠে বসল, ভোর হয়ে গিয়েচে, জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেচে।

উঃ, কি স্বপ্নটাই দেখেচে যে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! বলে তো অনেকে।

অনেকদিনের আগেকাব একটা ভাঙ্গা পুণো নো মন্দির আছে তাদের গাঁয়ে। বারুংইয়ার এক ভুঁইয়ার জামাই মদন বায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরী করেন। এখন মদন বায়ের বংশে কেউ নেই। মন্দির ভেঙ্গে চুরে গিয়েচে, অশথ গাছ, বট গাছ গজিয়েচে কার্গিসে—কিন্তু যেখানে ঠাকুরের বেদী, তার ওপরের খিলেনটা এখনও ঠিক আছে। কোনো মূর্তি নেই, তবুও শনি মঙ্গল বারে পূজা হয়, মেয়েরা বেদীতে সিঁছর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায়, সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত

—যে যা মানত করে তাই হয়। শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের বুরির গায়ে একটা টিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এল।

বিকলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সাম্নে দুর্বাঘাসের বনে বসে রইল। জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হোলেও বনে ঘেরা, কাজেই একটা পোড়ো বাড়ী ; এদের বাড়ীতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে—সেই থেকে বাড়ীর মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্ত্র বাস করছেন। সবাই বলে জায়গাটায় ভূতের ভয়। একা বড় কেউ এদিকে আসে না। শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভাল লাগে।

ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে বসে গিয়েচে। এই বনের মধ্যে বসে শঙ্করের আবার সেই ছবিটা মনে পড়ল—সেই মড়, মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙ্চে বুনোহাতীর দল, পাহাড়ের অধিত্যকার নিবিড় বনে পাতালতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উচুতে পর্বতের জ্যোৎস্নাপাণ্ডুর তুষারবৃত্ত শিখর দেশটা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করচে। কত স্বপ্ন তো সে দেখেছে জীবনে—এত সুস্পষ্ট ছবি স্নপ্নে সে দেখেনি কখনো—এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপ্ন তার মনে।.....

সব মিথ্যে। তাকে যেতে হবে পাটের কলে চাকুরী করতে। তাই তার ললাট-লিপি নয় কি ?





কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তা উপলব্ধি করে ঘটতে গেলে পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে।

শঙ্করের জীবনেও এমন একটা ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গেল।

সকালবেলা সে একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে এসে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছে, এমন সময়ে ওপাড়ার রামেশ্বর মুখুয্যেব স্ত্রী একটুকুরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বলেন—বাবা শঙ্কর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেক দিন পবে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়ীতে চিঠি দিয়েছে, কাল পিষ্টু সেখান থেকে এসেছে এই ঠিকানা তারা লিখে দিয়েছে। পড়তো বাবা ?

শঙ্কর বলেন—উঃ প্রায় ছুবছরের পর খোঁজ মিলল। বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন ! এর আগেও তো একবার পালিয়ে গেছিলেন—না ? তারপর সে কাগজটা খুললে। লেখা আছে—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড অফিস, কনষ্ট্রাক্সন ডিপার্টমেন্ট, মোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা।

শঙ্করের হাত থেকে কাগজের টুকুরোটা পড়ে গেল। পূর্ব আফ্রিকা ! পালিয়ে মানুষে এতদূর যায় ? তবে সে জানে ননীবালা দিদির এই স্বামী অত্যন্ত একরোকা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরণের। একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের আলাপও হয়েছিল—শঙ্কর তখন এন্ট্রাল ক্লাসে সবে উঠেছে। লোকটা খুব উদার প্রকৃতির, লেখাপড়া ভালই জানে, তবে

কোন একটা চাকুরীতে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, উড়ে বেড়ানো স্বভাব। আর একবার পালিয়ে বর্ষা না কোচীন কোথায় যেন গিয়েছিল। এবারও বড় দাদার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ার দরুণ বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—এ খবর শঙ্কর আগেই শুনেছিল। সেই প্রসাদ বাবু পালিয়ে গিয়ে ঠেলে উঠেছে একেবারে পূর্ব আফ্রিকায়।

রামেশ্বর মুখুয্যের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর জামাই কতদূরে গিয়েছে। অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে লিখে রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদ বাবুকে একখানা চিঠি দিলে। শঙ্করকে তাঁর মনে আছে কি? তাঁর স্বস্তির বাড়ী বর্ষা গায়ের ছেলে সে। এবার এক, এ, পাশ দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। জিনিষ কি একটা চাকুরী করে দিতে পারেন তাঁদের বেতনের মধ্যে? যতদূরে হয় সে যাবে।

দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে চিঠির উত্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে—তখন একখানা খামের চিঠি এল শঙ্করের নামে। তাতে লেখা আছে :—

মোতামাসা

১০২ পোট ষ্ট্রীট

প্রিয় শঙ্কর,

তোমার পত্র পেয়েছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। কজির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে গিয়েছিলুম, সে কথা

ভুলিনি। তুমি আসবে এখানে? চলে এসো। তোমার মত ছেলে যদি বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরুবে? এখানে নতুন রেল তৈরী হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত তাড়াতাড়ি পারো, এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের—প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুসি। যৌবনে তিনিও নিজে ছিলেন ডানপিটে ধরণের লোক। ছেলে পাটের কলে চাকুরী করতে যাবে তাঁর এতে মত ছিল না, শুধু সংসারের অভাব অনটনের দরুণ শঙ্করের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর মাস খানেক পরে শঙ্করের নামে এক টেলিগ্রাম এল দাদাশ্বর থেকে সেই জামাইটী দেশে এসেছেন সম্প্রতি। শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কবে টেলিগ্রাম পেয়েই। তিনি আবাব মোম্বাসায় ফিরবেন দিন কুড়ির মধ্যে। শঙ্করকে তাহোলে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যেতে পারেন।

## দুই

চার মাস পরের ঘটনা। মার্চ মাসের শেষ।

মোম্বাসা থেকে যে রেলপথ গিয়েচে কিম্বু-ভিক্টোরিয়া নায়ান্জা হ্রদের ধারে—তারই একটা শাখা লাইন তখন তৈরী হচ্ছিল। জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিন শো মাইল পশ্চিমে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের বুড্‌স্‌বার্গ স্টেশন থেকে বাহাত্তর

মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। এখানে শঙ্কর কনষ্ট্রাক্সন ক্যাম্পের কেরানী ও সরকারী ষ্টোর্কিপার হয়ে এসেচে। থাকে ছোট একটা তাঁবুতে। তার আশে পাশে অনেক তাঁবু। এখানে এখনও বাড়ীঘর তৈরী হয় নি বলে তাঁবুতেই সবাই থাকে। তাঁবুগুলো একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো—তাদের চারিধার ঘিরে বহু দূরব্যাপী মুক্ত প্রান্তর, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে গাছ। তাঁবুগুলোর ঠিক গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব্ গাছ। আফ্রিকার বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছবিতে দেখেছে, এবার সত্যিকার বাওবাব্ দেখে শঙ্করের যেন আশ মেটে না।

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন—সে ইউগাণ্ডার এই নির্জন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খুঁজে পেলেন। কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে পড়তো—যেদিকে ছুঁচোখ যায় সেদিকে বেড়াতে বের হ'ত—পূবে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, উত্তরে। সব দিকেই লম্বা লম্বা ঘাস, কোথাও মানুষের মাথা সমান উঁচু, কোথাও তার চেয়েও উঁচু।

কনষ্ট্রাক্সন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিন শঙ্করকে ডেকে বল্লেন—শোনো রায়, ওরকম এখানে বেড়িও না। বিনা বন্দুকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো। পথ হারিয়ে লোকে এসব জায়গায় মারাও গিয়েচে জলের অভাবে। দ্বিতীয়,

ইউগাণ্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর হাতুড়ী ঠোকার আওয়াজে সিংহ হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েচে—কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই। খুব সাবধান। এ সব অঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয়।

একদিন ছপ্তরের পবে কাজকর্ম বেশ পুর্বোদমে চলচে, হঠাৎ তাঁবু থেকে কিছুদূরে লম্বা ঘাসের জমির মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সেদিকে ছুটে গেল ব্যাপাব কি দেখতে। শব্দরও ছুটল—ঘাসের জমি পাতি পাতি কবে খোঁজা হোল—কিছুই নেই সেখানে

কিসের চীৎকার তবে ?

এঞ্জিনিয়ার সাহেব এলেন। কুলীদেব নাম-ডাক হোল, দেখা গেল একজন কুলী অনুপস্থিত। অনুসন্ধানে জানা গেল সে একটু আগে ঘাসের বনের দিকে কি কাজে গিয়েছিল, তাকে ফিরে আসতে কেউ দেখে নি।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ঘাসের বনের বাইবে কটা বাগিচা ওপরে সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। সাহেব বন্দুক নিয়ে লোকজন সঙ্গে পায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলীর বক্তাক্ত দেহ বার করলেন।

তাকে তাঁবুতে ধরাধরি কবে নিয়ে আসা হোল। কিন্তু সিংহের কোনো চিহ্ন মিলল না। লোকজনের চীৎকারে সে

শিকার ফেলে পালিয়েচে। সন্ধ্যাব পূর্বেই কুলীটা মারা গেল।

তাবুব চাবিপাশেব লম্বা ঘাস অনেকদূর পর্য্যন্ত কেটে সাফ্ কবে দেওয়া গেল পবদিনহ। দিনকতক সিংহেব কথা ছাড়া তাঁবুতে আব কোনো গল্পই নেই। তাবপব মাসখানেক পবে ঘটনাটা পুনরণে হয়ে গেল, সে কথা সকলেব মনে চাপা পড়ে গেল। কাজকর্ম আবাব বেশ চলল।

সেদিন দিনে খুব গরম। সন্ধ্যাব একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ল। কুলীদেব তাবুব সামনে অনেক কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন কবা হয়েচে। সেখানে তাবুব সবাই গোল হয়ে বসে গল্পগুজব কবচে। শঙ্কবও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প শুনচে এব অগ্নিকণ্ডেব আলোতে 'কেনিয়া মণিং নিউজ্' পডচে। খববেব বাগজখানা পাচদিনেব পুরোণে। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরে এব এখানেতে বাইবেব ছুনিয়াব যা কিছু একটু খবব পাওয়া যায়।

তিকুমল অন্ধা বলে একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে শঙ্কবেব খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিকুমল্ তরুণ যুবক, বেশ ইবাজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ! সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেচে অ্যাড্ভেঞ্চারেব নেশায়। শঙ্কবেব পাশে বসে সে আজ সন্ধ্যা থেকে ক্রমাগত দেশেব কথা, তাব বাপ মায়েব কথা, তাব ছোট বোনেব কথা বলচে। ছোট বোনকে সে বড় ভালবাসে। বাড়ী হেঁডে এসে তার কথাই তিকুমলেব বড় মনে



অগ্নিকুণ্ডের আলোকে শঙ্কর 'কেনিয়া মর্গিং নিউজ' পড়ছে...

হয়। 'একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। মাস দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব ?

ক্রমে রাত বেশী হোল। মাঝে মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, আবার কুলীরা তাতে কাঠ কুটো ফেলে দিচ্ছে। আরও অনেকে উঠে শুতে গেল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙ্গা চাঁদ ধীরে ধীরে দূর দিগন্তে দেখা দিল—সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো আধারের লুকোচুরি আর বুনো গাছের দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া।

শঙ্করেব ভারী অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই স্তব্ধ রাত্রির সৌন্দর্য্য। কুলীদের ঘরের একটা খুঁটাতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সে সম্মুখের বিশাল জনহীন তৃণভূমির আলো-আঁধারমাখা রূপেব দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছিল। ওই বাওবাব গাছটার ওদিকে অজানা দেশের সীমা কেপটাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত—মধ্যে পড়বে কত পর্ব্বত, অরণ্য, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর জিম্বাবু—বিশাল ও বিভীষিকাময় কালাহারি মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খনির দেশ !

একজন বড় স্বর্ণান্বেষী পর্য্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন—সেটা হাতে তুলে ভাল কবে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা মেশানো রয়েছে। সে যায়গায় বড় একটা সোনার খনি বেরিয়ে পড়ল। এ ধবণের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে।

এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশে, সোনার দেশ, হীরের দেশ—কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা



জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসাব রেখেচে ?

কত কি ভাবতে ভাবতে শঙ্কর কখন ঘুমিয়ে পড়েচে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেচে। ধ্বংসের সাদা জ্যোৎস্না দিনের মত পরিষ্কার। অগ্নিকুণ্ডের আগুন গিয়েচে নিবে। কুলীরা সব কুণ্ডলী পাকিয়ে আগুনের ওপরে শুয়ে আছে। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ শঙ্করের দৃষ্টি পড়ল তার পাশে—এখানে তো তিরুমল আপ্পা বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। সে কোথায় ? তাহোলে হয়তো সে তাঁবু মध्ये ঘুমতে গিয়ে থাকবে।

শঙ্করও নিজে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করচে, এমন সময়ে অল্পদূরেই পশ্চিম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহগর্জন শুনতে পাওয়া গেল। রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক যেন কেঁপে উঠল সে রবে। কুলীরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবু বাইরে এলেন। শঙ্কর জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গর্জন—সেই দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে কি এক অনির্দেশ্য অনুভূতি তার মনে জাগালে!—তা ভয় নয়, সে এক রহস্যময় ও জটিল মনোভাব। একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলী ছিল তাঁবুতে। সে বললে, সিংহ লোক নেবেচে। লোক না মারলে এমন গর্জন করবে না।

তাঁবুর ভেতর থেকে তিরুমলের সঙ্গী এসে হঠাৎ জানালে তিরুমলের বিছানা শূন্য। সে তাঁবুর মধ্যে কোথাও নেই।

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল। শঙ্কর নিজে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখে এল সত্যিই সেখানে কেউ নেই। তখনি কুলীরা আলো জ্বলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সব তাঁবু-গুলোতে খোঁজ করা হোল, নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি করলে সবাই মিলে—তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না।

তিরুমল যেখানটাতে শুয়ে ছিল, সেখানটাতে ভাল করে দেখা গেল তখন। একটা কোনো ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মাটির ওপর সুস্পষ্ট। ব্যাপারটা বুঝতে কাবো দেবী হোল না। বাওবাব্ গাছের কাছে তিরুমলের জামার হাতার খানিকটা টুক্বো পাওয়া গেল। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে আগে আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল। কুলীরা তাঁদের অনুসরণ কবতে লাগল। সেই গভীর রাত্রে তাঁবু থেকে দূরে মাঠের চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হোল, তিরুমলের দেহেব কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার সিংহ গর্জন শোনা গেল—কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের অধিপাত্রী কোনো রহস্যময়ী রাক্ষসীর বিকট চীৎকার।

মাসাই কুলীটা বল্লে—সিংহ দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেকগুলো মানুষ ও ঘাল না করে ছাড়বে না। সবাই সাবধান। যে সিংহ

একবার মানুষ খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত খুঁত হয়ে ওঠে।

রাত্রি যখন তিনটে, তখন সবাই ফিরল তাঁবুতে। বেশ ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার এই অংশে পাখী বড় একটা দেখা যায় না দিনমানে, কিন্তু এক ধরনের স্নাত্তিচর পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় রাত্রে—সে সুর অপার্থিব ধরনের মিষ্ট। এইমাত্র সেই পাখী কোন গাছের মাথায় বহুদূরে ডেকে উঠল। মনটা এক মুহূর্তে উদাস করে দেয়। শঙ্কর ঘুমতে গেল না। আর সবাই তাঁবুর মধ্যে শুতে গেল— কারণ পরিশ্রম কারো কম হয়নি। তাঁবুর সামনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা গেল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে অবিশি পারলে না—এ রকম ঙ্গসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোকিত অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল।

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব। তিকমলের অদৃষ্টলিপি এই জগ্গেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল। তাকেই বা কি জগ্গে এখানে এনেচে তার অদৃষ্ট, কে জানে তার খবর?

আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে—কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর! দেখতে বাব্বা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা...পর মুহূর্তে কি ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।

আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে—তরুণ হিন্দুযুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।

তিরুমল তো গেল, সঙ্গে সাহ ক্যাম্পে পরদিন থেকে এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা যায় না। মানুষ-থেকো সিংহ অতি ভয়ানক জানোয়ার! যেমন সে ধূর্ত, তেমনি সাহসী। সন্ধ্যা তো দূরের কথা, দিনমানেই একা বেশীদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড় বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, কুলীরা আগুনের কাছে ঘেঁসে বসে গল্প করে, রান্না করে, সেখানে বসেই খাওয়া দাওয়া করে। এঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্দুক হাতে রাত্রে তিন চার বার তাঁবুর চারিদিকে ঘুরে পাহাড়া দেন, ফাঁকা ছাওড় করেন—এত সতর্কতার মধ্যেও একটা কুলীকে সিংহে নিয়ে পালালো তিরুমলকে মারবার ঠিক ছুদিন পরে সন্ধ্যা রাত্রে। তারপর দিন একটা সোমালি কুলী ছপুরে তাঁবু থেকে তিনশো গজের মধ্যে পাথরের ঢিবিতে পাথর ভাঙতে গেল—সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না।

সেই রাত্রেই, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাঁবু থেকে ফিরে, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, সকাল সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে ওখানে দু'একটা নির্বাপিত প্রায় অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকচে—শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্করের মনে হয়...

বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে — চোখ বুঁজে সে নিজের গ্রামটা ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই বিলিতি আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে—আজও সে একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজলে।

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে জানালার কাছে তক্তাপোষে শুয়ে? বিলিতি আমড়া গাছটার ডালপালা চোখ খুললেই চোখে পড়বে? ঠিক? দেখবে সে চোখ খুলে?

শঙ্কর ধীরে ধীরে চোখ খুললে।

অন্ধকার প্রান্তর। দূরে সেই বড় বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। ইঠাৎ তার মনে হোল সামনের একটা ছাতার মত গোল খড়ের নীচু চালের ওপর একটা কি যেন নড়চে। পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রকাণ্ড একটা সিংহ খড়ের চাল খাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করবার চেষ্টা করচে ও মাঝে মাঝে নাকটা চালের গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে কিসের যেন ভ্রাণ নিচ্ছে!

তার কাছে থেকে চালাটার দূরত্ব বড় জোর বিশ হাত।

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। সিংহ চালার খড় খুঁচিয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে — শঙ্করকে সে এখনও দেখতে পায়নি। তাঁবুর বাইরে লোক নেই, সিংহের ভয়ে বেশী রাতে কেউ বাইরে

থাকে না। নিজে সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, একগাছ লাঠি পর্য্যন্ত নেই হাতে।

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছু হঠতে লাগল এঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে সিংহের দিকে চোখ রেখে। এক মিনিট... দু মিনিট... নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানতো না। একটা ভীতিসূচক শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরুল না



বা সে হঠাৎ পিছু ফিরে দৌড় দেবার চেষ্টাও করলে না।

এঞ্জিনিয়ারের তাঁবু পর্দা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব টেবিলে বসে তখনও কাজ করচে। সাহেব ওর রকম সকম দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও বল্লে— সাহেব, সিংহ !...

সাহেব লাফিয়ে উঠল—কৈ ? কোথায় ?

বন্দুকের র্যাকে একটা '৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফল ছিল—সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে। শঙ্করকে আর একটা রাইফল দিলে। ছুজনে তাঁবুর পর্দা তুলে আস্তে আস্তে বাইরে এল। একটু দূরেই কুলী লাইনের সেই গোল চালা। কিন্তু চালার ওপর কোথায় সিংহ? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—এই মাত্র দেখে গেলাম শুরু। ঐ চালার ওপর সিংহ থাকা দিয়ে খড় খোঁচাচ্ছে।

সাহেব বল্লে—পালিয়েচে। জাগাও সবাইকে।

একটু পরে তাঁবুতে মহা সোরগোল পড়ে গেল। লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুগুর নিয়ে কুলীর দল হুলা করে বেরিয়ে পড়ল—খোঁজ খোঁজ চারিদিকে খড়ের চাল সত্যিই ফুটো দেখা গেল। সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সিংহ উধাও হয়েছে। আগুনের কুণ্ডে বেশী করে কাঠ ও শুকনো খড় ফেলে আগুন আবার জ্বালানো হোল। সে রাত্রে অনেকেরই ভাল ঘুম হোল না, কিন্তু তাঁবুর বাইরেও বড় একটা কেউ রইল না। শেষ রাত্রেব দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবুতে শুতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা মহা সোরগোলের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাসাই কুলীরা 'সিন্ধা' 'সিন্ধা' বলে চীৎকার করচে। ছবার বন্দুকের আওয়াজ হোল। শঙ্কর তাঁবুর বাইরে এসে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে জানলে সিংহ এসে আস্তাবলের একটা ভারবাহী অশ্বতরকে জখম কবে গিয়েচে—এই মাত্র! সবাই শেষ রাত্রে একটু ঝিমিয়ে পড়েচে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড।

পরদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলীকে তাঁবু থেকে একশো হাতের মধ্যে সিংহে নিয়ে গেল। দিন চারেক পরে আর একটা কুলীকে নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে।

কুলীরা আর কেহ কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে গাঁতিওয়ালা কুলীদের অনেক সময়ে খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করতে হয়—তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বেশীদূর যেতে চায় না। তাঁবুর মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। সকলেরই মনে ভয়—প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। কাকে কখন নেবে কিছু স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় না। কেবল মাসাই কুলীরা অবিচলিত রইল—তারা যমকেও ভয় করে না। তাঁবু থেকে দু'মাইল দূরে গাঁতির কাজ তারাই করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার পাঁচবার তাদের দেখাশুনা করে আসে।

কত নতুন ব্যবস্থা করা হোল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব কমল না। কত চেষ্টা করেও সিংহ শিকার করা গেল না। অনেকে বললে সিংহ একটা নয়, অনেকগুলো—ক'টা মেরে ফেলা যাবে? সাহেব বললে—মানুষ-থেকে সিংহ বেশী থাকে না। এ একটা সিংহেরই কাজ।

একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে আসতে। শঙ্কর বললে—সাহেব তোমার ম্যানলিকারটা দাও।

সাহেব রাজী হোল। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে একটা অশ্বতরে



চড়ে রওনা হোল—তাঁবু থেকে মাইল দূরে একজায়গায় একটা ছোট জলা। শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে পেয়েচে, তখন বেলা প্রায় তিনটে। কেউ কোনো দিকে নেই, রোদের ঝাঁজ মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ অশ্বতর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর কিছুতেই সেটা এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হোল জায়গাটার দিকে যেতে অশ্বতরটা ভয় পাচ্ছে। একটু পরে পাশের ঝোপে কি যেন একটা নড়ল। কিন্তু সেদিকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলো না। সে অশ্বতর থেকে নামল। তবুও অশ্বতর নড়তে চায় না।

হঠাৎ শঙ্করের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝোপের মধ্যে সিংহ তার জন্তো ওং পেতে বসে নেই তো? অনেক সময়ে এ রকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অনুসরণ করে। নির্জনে স্থানে সুবিধা বুঝে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি তাই হয়? শঙ্কর অশ্বতর নিয়ে আব এগিয়ে যাওয়া উচিত বিবেচনা করলে না। ভাবলে তাঁবুতে ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অশ্বতরের মুখটা ফিরিয়েছে, এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক সিংহ গর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিবট দেহ সশব্দে অশ্বতরের ওপর এসে পড়ল। শঙ্কর তখন হাত চারেক এগিয়ে আছে। সে তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক

উচিয়ে উপরি উপরি ছ'বার গুলি করলে। গুলি লেগেচে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখন অশ্বতর মাটীতে লুটিয়ে পড়েচে—  
ধূসর বর্ণের জানোয়ারটা পলাতক। শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অশ্বতরের কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস ছিল ভিন্ন, রক্তে মাটী ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রনায় সেটা ছটফট করচে। শঙ্কর এক গুলিতে তার যন্ত্রনার অবসান করলে।

তারপর সে তাঁবুতে ফিরে এল। সাহেব বল্লেন সিংহ নিশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের গুলি যদি গায়ে লাগে তবে দস্তুর মত জখম তাকে হতেই হবে। কিন্তু গুলি লেগেছিল তো? শঙ্কর বল্লেন গুলি লাগালাগির কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছুঁড়েছিল, এইমাত্র কথা। লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে ছুঁ তিন দিনেও কোন আহত বা মৃত সিংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

জুন মাসের প্রথম থেকে বর্ষা নামল। কতকটা সিংহের উপদ্রবের জন্তে, কতকটা বা জলাভূমির সান্নিধ্যেব জন্তে অস্বাস্থ্যকর হাওয়ায় তাঁবু ওখান থেকে উঠে গেল।

শঙ্করকে আর কনষ্ট্রাক্সন তাঁবুতে থাকতে হোল না। কিসুমু থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট ষ্টেশনে সে ষ্টেশন মাষ্টারের কাজ পেয়ে জিনিষ পত্র নিয়ে সেইখানেই চলে গেল।

## তিন

নতুন পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন ষ্টেশনটাতে এসে নামল, তখন বেলা তিনটে হবে। ষ্টেশন ঘরটা খুব ছোট। মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর ষ্টেশন ঘরের আশ পাশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেঁষা। ষ্টেশন ঘরের পেছনে তার থাকবার কোয়ার্টার। পায়রার খোপের মত ছোট। যে ট্রেনখানা তাকে বহন কবে এনেছিল, সেখানা কিসুমুর দিকে চলে গেল। শঙ্কর যেন অকূল সমুদ্রে পড়ল। এত নির্জন স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করে নি।

এই ষ্টেশনে সেই একমাত্র কর্মচারী। একটা কুলী পর্যন্ত নেই। সেই কুলী, সে-ই পয়েন্টস্ম্যান, সেই সব।

এ রকম ব্যবস্থাব কারণ হচ্ছে এই যে এ সব ষ্টেশন এখনও মোটেই আয়কর নয়। এর অস্তিত্ব এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। এদের পেছনে রেল-কোম্পানী বেশী খরচ করতে রাজী নয়। একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল—আর সারাদিন রাত ট্রেন নেই।

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে। চার্জ বুঝে নিতে হবে এই যা একটু কাজ। আগের ষ্টেশন মাষ্টারটী গুজরাটী, বেশ ইংরেজী জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল। চার্জ বোঝাবার বেশী কিছু নেই। গুজরাটী ষ্টেশন মাষ্টার তাকে পেয়ে খুব খুসি। ভাবে বোধ হোল সে

কথা বলবার সঙ্গী পায় নি অনেকদিন। ছুজনে প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক পায়চারী করলে।

শঙ্কর বললে—কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন?

গুজরাটী ভদ্রলোকটী বললে—ও কিছু নয়। নির্জন জায়গা—তাই।

শঙ্করের মনে হোল কি একটা কথা লোকটা গোপন করে গেল। শঙ্করও আর পীড়াপীড়ি করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক রুটী গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে। খেতে বসে হঠাৎ লোকটী চোঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ ভুলে গিয়েছি।

—কি হোল?

—খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে গিয়েছি।

—সে কি? এখানে খাবার জল কোথাও পাওয়া যায় না।

—কোথাও না। একটা কুয়ো আছে, তার জল বেজায় তেতো আর কসা। সে জলে বাসন মাজা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে দিয়ে যায়।

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, মানুষ-জন নেই। এখানে টেশন কবেছে কেন তা শঙ্কর বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ভূতপূর্ব টেশন মাষ্টার চলে গেল। শঙ্কর পড়ল একা। নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের সময় প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। ছুপুরে বই পড়ে কি বড়

টেবিলটাতে শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করে।

ষ্টেশনের চারিধার ঘিরে ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাব্লা গাছ—দূরে পাহাড়ের সারি সারা চক্রবাল জুড়ে। ভারী সুন্দর দৃশ্য।

গুজরাটী লোকটী ওকে বারণ করে গিয়েছিল—একা যেন এই সব মাঠে সে না বেড়াতে বার হয়।

শঙ্কর বলেছিল—কেন ?

সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাটী ভদ্রলোকটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি ! কিন্তু তার উত্তর অগ্নি দিক থেকে সে রাত্রিই গিল্ল।

সকাল রাতেই আহারাদি সেরে শঙ্কর ষ্টেশন ঘরে বাতি জ্বালিয়ে বসে ডায়েরী লিখ্চে—ষ্টেশনঘরেই সে শোবে—সামনের কাচ-বসানো দরজাটী বন্ধ আছে—কিন্তু আগল দেওয়া নেই—কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে দেখে—দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগিয়ে প্রকাণ্ড সিংহ ! শঙ্কর কাঠের মত বসে রইল। দরজা একটু জোর করে ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। টেবিলের ওপর কেবল কাঠের রুলটা মাত্র আছে।

সিংহটা কিন্তু কৌতুহলের সঙ্গে শঙ্কর ও টেবিলের কেরোসিন বাতিটার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খুব বেশীক্ষণ ছিল না, হয়তো মিনিট দুই—কিন্তু শঙ্করের মনে

হোল সে আব সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সিংহ ধীরে ধীরে অনাসক্ত ভাবে দরজা থেকে সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে ষ্টেশনের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া কেন আছে। কিন্তু শঙ্কর একটু ভুল করেছিল— সে আংশিক ভাবে বুঝেছিল মাত্র, বাকী উত্তরটা পেতে হুএকদিন বিলম্ব ছিল।

সেটা এল অন্য দিক থেকে।

পরদিন সকালেব ট্রেনের গার্ডকে সে রাত্রেব ঘটনা বললে। গার্ড লোকটা ভাল, সব শুনে বললে—এ সব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখান থেকে বাবো মাইল দূরে আব একটা তোমার মত ছোট ষ্টেশন আছে—সেখানেও এই দশা। এখানে তো যে কাণ্ড—

সে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কথা বন্ধ করে ট্রেনে উঠে পড়ল। যাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে গেল, বেশ সাবধানে থেকো সর্বদা—

শঙ্কর চিন্তিত হয়ে পড়ল—এরা কি কথাটা চাপা দিতে চায়? সিংহ ছাড়া আবও কিছু আছে নাকি? যাহোক, সেদিন থেকে শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে ষ্টেশন ঘবেব সামনে রোজ আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে:

ষ্টেশন ঘরে ঢোকে—অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশুনো করে বা ডায়েরী লেখে। রাত্রের অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডাল-পালার মধ্যে দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, এক এক দিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—অদ্ভুত জীবন।

ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল। এ তার রস্কে আছে। এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, এই বিপদের আশঙ্কা—এই তো জীবন। শান্ত নিরাপদ জীবন নিরীহ কেবাগীর জীবন হতে পারে—তার নয়।

সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের কোয়ার্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে তিন হাত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল—প্রকাণ্ড একটা হৃদে খড়িশ গোখুরা তাকে দেখে ফণা উত্তত করে খুঁটি থেকে প্রায় একহাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে! আর দু সেকেণ্ড পরে যদি শঙ্করের চোখ সেদিকে পড়ত— তাহোলে—না, এমন সাপটাকে মারবার কি করা যায়? কিন্তু সাপটা পরমুহূর্তে খুঁটি বেয়ে ওপোরে খড়ের চালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বেশ কাণ্ড বাটে। ঐ ঘরে গিয়ে শঙ্করকে এখন ভাত রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে

আগুন জ্বলে রাখবে। খানিকটা ইতস্ততঃ করে শঙ্কর অগত্যা রান্নাঘরে ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে সন্ধ্যা হবার আগেই খাওয়াদাওয়া সাদ্ধ করে সেখানে থেকে বেরিয়ে স্টেশনঘরে এল। কিন্তু স্টেশন ঘবেই বা বিশ্বাস কি? সাপ কখন কোন ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

পরদিনের সকালের ট্রেনে গার্ডের গাড়ী থেকে একটা নতুন কুলী তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল। সপ্তাহে ছুদিন মোম্বাসা থেকে চাল আর আলু বেলকোম্পানী এই সব নির্জনে স্টেশনের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেয়—মাসিক বেতন থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়।

যে কুলীটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ইণ্ডিয়ান, গুজরাট অঞ্চলে বাড়ী। সে বস্তাটা নামিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চাইলে শঙ্করের দিকে, এবং পাছে শঙ্কর তাকে কিছু জিগ্যেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ল।

কুলার সে দৃষ্টি শঙ্করের চোখ এড়ায় নি। কি রহস্য জড়িত আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ করতে চায় না—প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কি?

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজেব কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে—আর একটু হোলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল



আর কি! সেই খড়িশ গোথুরা সাপ। পূর্বদৃষ্ট সাপটাও হোতে পারে, নতুন একটা যে নয় তার কোনো প্রমাণ নেই।

শঙ্কর সেই দিন ষ্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার ও চারি-ধারের জমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে। সারাজায়গা মাটিতে বড় বড় গত্ত, কোয়ার্টারের উঠানে, রান্নাঘরের দেওয়ালে, কাঁচা প্ল্যাটফর্মের মাঝে মাঝে সর্বত্র গত্ত ও ফাটল আর ইঁদুরের মাটি। তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না।

এক দিন সে ষ্টেশন ঘরে ঘুমিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর অন্ধকার—হঠাৎ শঙ্করের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাঁচটা ইন্ড্রিয়ের বাইরে আর একটা কোন্ ইন্ড্রিয় যেন মুহূর্তের জুড়ে জাগরিত হয়ে উঠে তাকে জানিয়ে দিলে যে সে ভয়ানক বিপদে পড়বে। ঘোর অন্ধকার, শঙ্করের সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। টর্চটা হাতড়ে পাওয়া যায় না কেন? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ টর্চটা তার হাতে ঠেকল, এবং কলের পুতুলের মত সে সামনের দিকে ঘুরিয়ে টর্চটা জ্বাললে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঁঠ হয়ে টর্চটা ধরে বিছানার ওপরই বসে রইল।

দেওয়াল ও তার বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় মাথা উঁচু করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুণ সাময়িক ভাবে আলো-আঁধারি লেগে থ' খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রুর ও হিংস্রতম

সর্প—কালো মানুষ! ঘরের মেজে থেকে সাপটা প্রায় আড়াই হাত উঁচু হয়ে উঠেচে—সেটা এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যখন ব্ল্যাক মানুষ সাধারণতঃ মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে! ব্ল্যাক মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এক প্রকার পুনর্জন্ম তাও শঙ্কর শুনেছে।



শঙ্কর একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে বিপদে তাব, সহজে বুদ্ধি ভ্রংশ হয় না—আব তাব স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোব বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

শঙ্কর বুঝলে হাত যদি তাব একটু কেঁপে যায়—তবে যে মুহূর্তে সাপটার চোখ থেকে আলো সবে যাবে—সেই মুহূর্তে ওর আলো-আধাবি কেটে যাবে এবং তখুনি সে করবে আক্রমণ।

সে বুঝলে তার আয়ু নির্ভর করচে এখন দৃঢ় ও অবিকম্পিত হাতে টর্চটা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার ওপর। যতক্ষণ সে এ রকম ধরে থাকতে পারবে ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যদি টর্চটা একটুও এদিক ওদিক সরে যায়— ?

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল। সাপের চোখ দুটো জ্বলচে যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ সক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উত্তত তার কালো, মিশমিশে, সরু দেহটাতে।...

শঙ্কর ভুলে গেল চারিপাশের সব আসবাব পত্র, আফ্রিকা দেশটা, তার রেলের চাকুরী, মোম্বাসা থেকে কিশুম লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা মা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের ওই দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে... তার বাইরে শূন্য! অন্ধকার! মৃত্যুর মত শূন্য, প্রলয়ের পঙ্কজের বিশ্বের মত অন্ধকার!

সত্যকেবুল ওই মহাহিংস্র উত্তত-ফণা সর্প, যেটা প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং দেবার জন্তে ওৎ পেতে রয়েছে।...

শঙ্করের হাত কিম্বিকিম্ব করচে, আঙ্গুল অবশ হয়ে আস্চে, কছুই থেকে বগল পর্য্যন্ত হাতের যেন সাড় নেই। কতক্ষণ সে আর টর্চ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের গোথ নয়...জোনাকী পোকা কিংবা নক্ষত্র...কিংবা...

টর্চের ব্যাটারির তেজ কমে আসছে না? সাদা আলো যেন হলুদে ও নিস্বেজ হয়ে আসছে না?...কিন্তু জোনাকী পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমনি জ্বলছে। রাত না দিন? ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিলে। ওই চোখ দুটোর জ্বালাময়ী দৃষ্টি তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তুলছে। সে সজাগ থাকবে। এ তেপান্তরের মাঠে চৌচালেও কেউ কোথাও নেই সে জানে—তাব নিজের স্নায়ুগুলীর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করছে তার জীবন। কিন্তু সে পারছে না যে, হাত যেন টন্টন্ করে অবশ হয়ে আসছে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে থাকবে? সাপে না হয় ছোবল দিক্ কিন্তু হাতখানা একটু নাগিয়ে নিলে সে আরাম বোধ করবে এখন।

তার পরেই ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজলো। ঠিক রাত তিনটে পর্য্যন্তই বোধ হয় শঙ্করের আয়ু ছিল, কারণ তিনটে বাজ্‌বাব সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেঁপে উঠে নড়ে গেল—সামনের আলোর দানা ছটো গেল নিভে। কিন্তু সাপ কৈ? তাড়া করে এলো না কেন?

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সাময়িক মোহগ্রস্ত হয়েছে তার মত। এই অবসব...বিহ্যতের চেয়েও বেগে সে টেবিল থেকে এক লাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে।

সকালের ট্রেন এল। শঙ্কর বাকী রাতটা প্ল্যাটফর্মেই কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার। গার্ড বললে—চলো দেখি স্টেশন ঘরের মধ্যে! ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের চিহ্নও পাওয়া গেল না। গার্ড লোকটা ভালো—বললে, বলি তবে শোনো। খুব বেঁচে গিয়েচ কাল রাত্রে। এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি, পাছে ভয় পাও। তোমার আগে যিনি স্টেশন মাস্টার এখানে ছিলেন—তিনিও সাপের উপদ্রবেই এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দু'জন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেচে! আফ্রিকার ব্র্যাক্‌ মাস্থা যেখানে থাকে, তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। বন্ধু ভাবে কথাটা বললাম, ওপরওয়ালাদেব বলো না যেন, যে আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেচ। ট্রান্সফারের দবখাস্ত কব।

শঙ্কর বলল—দরখাস্তের উত্তরে আসতেও তো দেরী হবে, তুমি একটা উপকার কবো। আমি এখানে একেবারে নিবস্ত্র। আমাকে একটা বন্দুক কি রিভলভার যাবাব পথে দিয়ে যাও। আর কিছু কার্ভলিক এ্যাসিড। ফিরবার পথেই কার্ভলিক এ্যাসিড্‌টা আমায় দিয়ে যেও।

- ট্রেন থেকে সে একটা কুলীকে নামিয়ে নিলে এবং দু'জনে মিলে সারাদিন সর্বত্র গর্ত বুঁজিয়ে বেড়ালে। পরীক্ষা কবে দেখে মনে হোল কাল রাত্রে স্টেশন ঘরের পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে একটা গর্ত থেকে সাপটা বেরিয়ে ছিল। গর্তগুলো

ইছুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইছুর খাবার লোভে গর্ভে চুকেছিল হয়তো। গর্ভটা বেশ ভাল করে বুঁজিয়ে দিলে। ডাউন ট্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বনিক এ্যাসিড্ পাওয়া গেল—ঘরের সর্বত্র ও পাশে পাশে সে এ্যাসিড্ ছড়িয়ে দিলে। কুলীটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে গেল। দু'তিন দিনের মধ্যে রেল কোম্পানী থেকে ওকে একটা বন্দুক দিলে।



## চার

ষ্টেশনে জলের বড় কষ্ট। ট্রেন থেকে যা জল দেখে, তাতে রান্না খাওয়া কোনো রকমে চলে—স্নান আর হয় না। এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েচে। এক দিন সে শুন্লে ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে। সেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, মাছও আছে।

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে এক দিন সে সকালের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল—সঙ্গে একজন সোমালি কুলী, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরাব সাজসরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আনিয়ে নিয়ে ছিল। জলাশয়টা মাঝারি গোছের, চারি ধারে উচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, নিকটেই একটা অনুচ্চ পাহাড়! জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা-দুই ছিপ্ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট ছোট মাছ অনেকগুলি পেলে। মাছ অদৃষ্টে জোটেনি অনেক দিন কিন্তু আর বেশী দেবী করা চলবে না—কারণ আবার বিকেল চারটের মধ্যে ষ্টেশনে পৌঁছানো চাই—বিকেলের ট্রেন পাশ করবার জন্যে।

প্রায়ই সে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায়। কোনোদিন সঙ্গে লোক থাকে—প্রায়ই একা যায়। স্নানের কষ্টও ঘুচেছে।

গ্রীষ্মকাল ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম—বেলা নটার পর থেকে আর রোজ্জে যাওয়া যায় না।

এগারোটার পর থেকে শঙ্করের মনে হয় যেন দিক্‌বিদিক্‌ দাঁউ দাঁউ করে জ্বলচে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে শুন্‌লে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গরমের কাছে এ নাকি কিছুই নয়।

শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জীবনের গতি মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল। একদিন সকালের দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়েছিল। যখন ফিরচে তখন বেলা তিনটে। ষ্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শঙ্করের কাণে গেল সেই রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় অফুট আর্দ্রস্বরে কি বলচে। কোন্‌ দিক থেকে স্বরটা আসচে, লক্ষ্য করে কিছুদূর যেতেই দেখলে একটা ইউকাগাছের নীচে স্বল্প মাত্র ছায়াটুকুতে কে একজন বসে আছে।

শঙ্কর দ্রুতপদে তার নিকটে গেল। লোকটা ইউরোপীয়ান—পরগে তালি দেওয়া ছিন্ন ও মলিন কোটপ্যান্ট। একমুখ লাল দাড়ি, বড় বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ সুশ্রী, দেহও বেশ বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্তু সম্ভবতঃ রোগে, কষ্টে ও অনাহারে বর্তমানে শীর্ণ। লোকটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে। তার মাথায় মলিন সোলার টুপিটা এক দিকে গড়িয়ে পড়েছে মাথা থেকে—পাশে একটা খাকি কাপড়ের বড় ঝোলা।

শঙ্কর ইংরিজিতে জিগোস্‌ করলে—তুমি কোথা থেকে আসচো?



লোকটা কথার উত্তর না দিয়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে জল পানের ভঙ্গি করে বললে—একটু জল ! জল !

শঙ্কর বললে এখানে তো জল নেই ? আমার ওপর ভর দিয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসতে পারবে ?

অতি কষ্টে খানিকটা ভর দিয়ে এবং শেষের দিকে এক রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্লাটফর্মে পৌঁছুলো। ওকে আনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল ; বিকেলের ট্রেন ওর অনুপস্থিতিতেই চলে গিয়েছে। ও লোকটাকে ষ্টেশন ঘরে বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে সুস্থ করলে, কিছু খাতাও এনে দিলে। সে খানিকটা চাক্ষু হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শঙ্কর দেখলে লোকটার ভাবী জ্বর হয়েচে। অনেক দিনের অনিয়মে পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েচে—ছ চাব দিনে সে সুস্থ হবে না।

লোকটা একটু পরে পবিচয় দিলে। তার নাম ডিয়েগো আলভারেজ—জাতে পটু'গিজ, তবে আফ্রিকার সূর্য্য তাব বর্ণ তামাটে করে দিয়েচে।

রাত্রে ওঁকে ষ্টেশনে রাখলে শঙ্কর। কিন্তু ওর অসুখ দেখে সে পড়ে গেল বিপদে—এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই—সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের ট্রেনে গার্ড রোগীকে তুলে নীয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাত কাটতে এখনো অনেক দেরী। বিকেলের গাড়ীখানা ষ্টেশনে এসে যদি পাওয়া যেত, তবে তো কোনো কথাই ছিল না।

শঙ্কর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল। লোকটির শরীরে কিছু নেই। খুব সম্ভবতঃ কষ্ট ও অনাহার ওর অসুখের কারণ। এই দূর বিদেশে ওর কেউ নেই—শঙ্কর না দেখলে ওকে দেখবে কে?...বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে—শঙ্কর যে ভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো আপনার লোক ওর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতো না।

উত্তর পূর্ব কোণের অনূচ্চ পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে চাঁদ উঠচে যখন সে রাত্রে—ঝন্ ঝন্ করচে নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি—তখন হঠাৎ প্রান্তবের মধ্যে ভীষণ সিংহ-গর্জন শোনা গেল। বোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল—সিংহের ডাকে সে ধড়মড় কবে বিছানায় উঠে বসল। শঙ্কর বলে—ভয় নেই—শুয়ে থাকো। বাইরে সিংহ ডাক্চে দরজা বন্ধ আছে।

তারপর শঙ্কর আস্তে আস্তে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চারিধারে চেয়ে দেখ্‌বা মাত্রই যেন সে রাত্রির অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললে। চাঁদ উঠ্‌চে দূরের আকাশপ্রান্তে—ইউকা গাছেব লম্বা লম্বা ছায়া পড়েচে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময়, নিষ্পন্দ। সিংহ ডাক্‌চে ষ্টেশনের কোয়াটারের পেছনে প্রায় পাঁচশো গজের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ডাক আজকাল গা-সওয়া হয়ে উঠেচে—ওতে আর আগের মত ভয় পায় না। রাত্রির সৌন্দর্য্য এত আকৃষ্ট করেছে ওকে, যে ও সিংহের সান্নিধ্য যেন ভুলে গেল।

ফিরে ও ষ্টেশন ঘরে ঢুকল। টং টং করে ঘড়িতে ছুটো বেজে গেল। ও ঘরে ঢুকে দেখলে রোগী বিছানায় উঠেই বসে আছে। বললে—একটু জল দাও খাবো।

লোকটা বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে। শঙ্কর টিন থেকে জল নিয়ে ওকে খাওয়ালে।

লোকটার জ্বর তখন যেন কমেচে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমাব ভয় করেছে ভাবছিলে? ডিয়েগো আল্ভারেজ্ ভয় কববে? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আল্ভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মিশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিলে। সে অবসন্নভাবে বালিসেব গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে শঙ্করের মনে হোল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের। বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙ্গুল—দড়ির মত শিরাবহুল হাত, তাত্রাভ দাড়িব নীচে চিবুকের ভাব, শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বব কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেবিয়ে আসচে যেন ধীরে ধীরে।

লোকটা বললে—সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেচ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশী করতে পারতো না। তবে একটা কথা বলি—আমি বাঁচবো না। আমার মন বলচে আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইণ্ডিয়ান? এখানে

কত মাইনে পাও ? এই সামান্য মাইনের জন্তে দেশ ছেড়ে এত দূরে এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আজ তোমাকে যে সব কথা বলবো—আমার মৃত্যুর পূর্বে তা তুমি কাবো কাছে প্রকাশ করবে না ?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশঃ কেটে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য ধরণের আশ্চর্য্য কাহিনী শুনে গেল—যা সাধারণতঃ উপন্যাসেই পড়া যায়।

ডিয়েগো আলভারেজেব কথা

ইয়্যাং ম্যান, তোমার বয়েস কত হবে ? বাইশ ?...তুমি যখন মায়েব কোলে শিশু—আজ বাইশ বছর আগের কথা, ১৮৮৮-৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনি সন্ধান কবে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, ছনিয়াব কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

বুলাওয়েও সহর থেকে জিনিষপত্র কিনে একাই রওনা হলাম, সঙ্গে কেবল দুটী গাধা, জিনিষপত্র বইবার জন্তে ! জাম্বুজী নদী পার হয়ে চলেছি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শুধু ছোট খাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে মাঝে কাফিরদের বসতি। ক্রমে যেন মানুষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গায় উপস্থিত

এসে পৌঁছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো টউরোপীয়ান আসে নি।

যেখানেই নদী বা খাল দেখি—কিংবা পাহাড় দেখি—সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি। লোকে কত কি পেয়ে বড় মানুষ হয়ে গিয়েচে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এ সম্বন্ধে বাল্যকাল থেকে কত কাহিনীই শুনে এসেছিলুম—সেই সব গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলেছিল। কিন্তু রুথাই ছ’ বৎসর ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালুম। কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই ছ’ বছরে। একবার তো সন্ধান পেয়েও হারালুম।

সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। ঝাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুই পড়লুম ছপূর বেলা—কারণ ছপূরের রোদে পথ চলা সে সব জায়গায় একরকম অসম্ভব—১১৫° ডিগ্রী থেকে ১৩০° ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েচে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ্ ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের টিবি, তার গায়ে সাদা দাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। টিবিটার গায়ে সেই জিনিষটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে ভারিই একটা দানা সংগ্রহ করে ঘসে মেজে নিয়ে আপাততঃ সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম।

তারপর বৈকালে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি, কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সে কথা ক্রমেই ভুলে গিয়েছি।

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল, সেও আমার মত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে দু'জন মাটাবেল কুলী ছিল। পরস্পরকে পেয়ে আমরা খুসি হলাম, তার নাম জিম্ কাটার, আমারই মত ভবঘুরে, তবে তার বয়স আমার চেয়ে বেশী। জিম্ একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বল্লে—বন্দুকের মাছি তোমার এ রকম কেন? তাবপব আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বল্লে—তুমি বুঝতে পাবো নি এ জিনিসটা খাঁটি রূপো, খনিজ রূপো। এ যেখানে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেখানে রূপোর খনি থাকে। আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর থেকে সেখানে অন্ততঃ ন'হাজার আউন্স রূপো পাওয়া যাবে। সে জায়গাতে এক্ষুণি চলো আমবা যাই। এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

সংক্ষেপে বলি। তাবপব কাটারকে সঙ্গে নিয়ে আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে আবার এলাম। কিন্তু চার মাস ধরে কত চেষ্টা কবে, কত অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কতবার বিবাট দিক্ দিশাহীন মকভূমিবৎ ভেল্লেব মধ্যে পথ হাবিয়ে, মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌছেও, কিছুতেই আমি সে স্থান নির্ণয় করতেই পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁবু উঠিয়ে

দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য করিনি জায়গাটা। আফ্রিকার ভেন্ডে কোনো চিহ্ন বড় একটা থাকে না, যার সাহায্যে পুরোণো জায়গা খুঁজে বার করা যায়—সবই যেন একরকম। অনেক বার হয়রাণ হয়ে শেষে আমরা রূপোর খনির আশা ত্যাগ করে গুয়াই নদীর দিকে চললাম। জিম্ কার্টার আমাকে আর ছাড়লে না, তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। তার সে শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনও আমার কষ্ট হয়।

তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব কষ্টের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ ধরে চলবো, এটী স্থির করা গেল। বনের জন্তু শিকার করে খাই আর মাঝে মাঝে কাফির বস্তি যদি পাই, সেখান থেকে মিষ্টি আলু, মুবগী প্রভৃতি সংগ্রহ করি।

একবার অরেঞ্জ নদী পার হয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী একটা কাফির বস্তীতে আশ্রয় নিয়েছি, সেই দিন ছপুরের পরে কাফির বস্তীর মোড়লের ঝেয়ে হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়ল। আমরা দেখতে গেলাম—পাঁচ ছ' বছরের একটা ছোট্ট উলঙ্গ মেয়ে মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে—তার পেটে নাকি ভয়ানক ব্যাথা। সবাই কাঁদচে ও দাপাদাপি করচে। মেয়েটার ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেচে—ওকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ মাকে জিজ্ঞাসা করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়েছিল—তারপর থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে। আমি ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের



পাঁচ ছ' বছরের একটা উলঙ্গ মেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।



ফল বেশী পরিমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল, কোনো বনের ফল সে খেয়েছিল কিনা? সে বললে—হ্যাঁ, খেয়েছিল। কাঁচা ফল? মেয়েটা বললে—ফল নয়, ফলের বীজ। সে ফলের বীজই খাদ্য।

একডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাস্ক ছিল। গ্রামে আমাদের খাতির হয়ে গেল খুব। পনেরো দিন আমরা সে গ্রামের সর্দারের অতিথি হয়ে রইলাম। ইলাণ্ড হরিণ শিকার করি আর রাত্রে কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ করি। বিদায় নেবার সময় কাফির সর্দার বললে—তোমরা সাদা পাথর খুব ভালবাস—না? বেশ খেল্‌বার জিনিস! নেবে সাদা পাথর? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। একটু পরে সে একটা ডুমুর ফলের মত বড় সাদা পাথর আমাদের হাতে এনে দিলে। জিম ও আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম—জিনিসটা হীরক!.....খনি বা খনির ওপরকার উপল্যাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর থেকে প্রাপ্ত পালিশ-না-করা হীরক খণ্ড!

কাফির সর্দার বললে—এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখচো, ধোঁয়া ধোঁয়া—এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। ঐ পাহাড়েব মধ্যে এ রকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেচি। আমবা কখনো যাইনি, জায়গা ভাল নয়, ওখানে বুনিপ বলে উপদেবতা থাকে। অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের গ্রামের তিন জন সাহসী লোক কারো বারণ না শুনে ঐ পাহাড়ে গিয়েছিল,

আর ফেরে নি। আর একবার একজন তোমাদের মত সাদা মানুষ এসেছিল, সেও অনেক, অনেক চাঁদ আগে। আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়েও আর ফেরেনি।

কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা ম্যাপ মিলিয়ে দেখলাম—দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে বিখ্যাত স্বেভল্ড পর্বতশ্রেণী—দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বাপেক্ষা বৃষ্টি, অজ্ঞাত, বিশাল ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চল। কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি—তু' একজন দুর্দ্বন্দ্ব দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।

জিম্ কার্টার ও আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল—আমবা তু'জনেই তখন স্থির করলাম। ওই অরণ্য ও পর্বতমালা আমাদেরই আগমন প্রতিকায় তার বিপুল রত্নভাণ্ডার লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন করে রেখেছে। আমরা ওখানে যাবোই।

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে আমরা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম।

পূর্বেই বলেছি দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির বসতি পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ল না। জঙ্গল দেখে মনে হোল কার্টুরিয়ার কুঠার আজ পর্য্যন্ত এখানে প্রবেশ করে নি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বের আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছে-  
ছিলাম। জিম্ কার্টারের পরামর্শ মত সেখানেই আমরা রাত্রের  
বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটাইলাম। জিম্ জঙ্গলের কাঠ কুড়িয়ে  
আগুন জ্বাললে—আমি লাগলুম বাগ্নাব কাজে। সকালের  
দিকে একজোড়া পাখী মেরেছিলাম, সেই পাখী ছাড়িয়ে তাব  
রোষ্ট্র কববো এই ছিল মতলব। পাখী ছাড়ানোর কাজে  
একটু ব্যস্ত আছি—এমন সময় জিম্ বল্লেন—পাখী বাখো।  
তু পেয়ালা কাফি কবো তো আগো।

আগুন জ্বলাই ছিল। জল গবম কবতে দিয়ে আবাব  
পাখী ছাড়াতে বসেছি, এমন সময় সিংহের গর্জ্জন একেবারে  
অতি নিকটে শোনা গেল। জিম্ বন্দুক নিয়ে বেকল, আমি  
বল্লাম—অন্ধকাব হয়ে আসচে, বেশী দূব যেও না। তাবপবে  
আমি পাখী ছাড়াচ্ছি - কিছু দূরে জঙ্গলের বাইবেই ছুবার  
বন্দুকেব আওয়াজ শুনলুম। একটুখানি থেমে আবাব আর  
একটা আওয়াজ। তারপরেই সব চুপ। মিনিট দশ কেটে  
গেল, জিম্ আসে না দেখে আমি নিজেব রাইফেল্টা নিয়ে  
যেদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকে একটু যেতেই দেখি  
জিম্ আসচে - পেছনে কি একটা ভাবী মত টেনে আনচে।  
আমায় দেখে বল্লেন—ভারী চমৎকাব ছাল খানা। জঙ্গলের  
ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় কবে দেবে। তাঁবুর কাছে  
টেনে নিয়ে যাই চল !

তু'জনে টেনে সিংহের প্রকাণ্ড দেহটা তাঁবুর আগুনের কাছে

নিয়ে এসে ফেললাম। তারপর ক্রমে রাত হোল। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে সিংহের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবু থেকে অল্প দূরেই সিংহ ডাক্চে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক কতদূরে। আমি রাইফেল নিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। জিম্ শুধু একবার বল্লে—সন্ধ্যাবেলার সেই সিংহটার জুড়ি।

বলেই সে নির্বিবকাব ভাবে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাঁবুব বাইরে এসে দেখি আগুন নিবে গিয়েচে, পাশে কাঠকুটো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর আগুন জ্বাললাম। তারপবে আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

পবদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে জনকয়েক কাফিরের সঙ্গে দেখা হোল। তারা হবিণ শিকাব কবতে এসেচে। আমরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নিতে চাইলাম।

তারা বল্লে—তোমরা জানো না তাই ও কথা বলচ। এ জঙ্গলে মানুষ আসে না। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। ঐ পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নীচু, ওটা পার হয়ে মধ্যে খানিকটা সমতল জায়গা আছে, বন বনে ঘেরা তার ওদিকে আবার এর চেয়েও উঁচু পর্বতশ্রেণী। ঐ বনের মধ্যের সমতল জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে বুনিপ্ থাকে। বুনিপের

হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে ? ভালো চাও তো তোমরাও যেও না।\*

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—বুনিপ্ কি ?

তারা জানে না। তবে তারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে বুনিপ্ কি, না জানলেও সে কি অনিষ্ট করতে পারে সেটা তারা খুব ভাল রকমই জানে।

ভয় আমাদের ধাতে ছিল না, জিম্ কার্টারের তো একে-বারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে—হীরা পাই বা না পাই। মৃত্যু যে তাকে অলক্ষিতে টান্চে, তখনও যদি বুঝতে পারতাম !

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলে একটু হাঁপিয়ে পড়ল শঙ্করের মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনও আর শোনে নি। মুগ্ধু ডিয়েগো আলভারেজের জীর্ণ পরিচ্ছদ ও শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু জোড়াব নীচেকার ইস্পাতের মত নীল দীপ্তিশীল চোখ ছুটোর দিকে চেয়ে, শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ভালবাসায় ভরে উঠল।

সত্যিকার মানুষ বটে একজন !

আলভারেজ বলে—আর একশ্বাস জল—

জলপান করে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলে :—

হাঁ, তারপরে শোনো। ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ

কবলাম। কত বড় বড় গাছ, বড় বড় ফাণ, কত বিচিত্রবর্ণের অর্কিড ও লায়ানা, স্থানে স্থানে সে বন নিবিড় ও ছুপ্রবেশ্য। বড় বড় গাছেব নীচেকার জঙ্গল এতই ঘন। বড়শিব মত কাঁটা গাছেব গায়ে, মাথাব ওপবকাব পাতায় পাতায় এমন জড়াজড়ি যে সূর্য্যেব আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের উৎপাত জঙ্গলেব সর্ব্বত্র, বড় গাছেব ডালে দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা বকমেব বেবুন বসে আছে—অনেক সময় দেখলাম মান্নুষেব আগমন তাবা গ্রাহ্য কবে না। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়—ছ-একটা বুড়ো সর্দাব বেবুন সত্যিই তিংস্র প্রকৃতিব, হাতে বন্দুক না থাকলে তাবা অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ কবত। জিম্ কাটাঁব বলে—অন্ততঃ আমাদের খাণ্ডেব অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে।

সাত আটদিন সেই নিবিড় জঙ্গলে কাটল। জিম্ কাটাঁব ঠিকই বলেছিল, প্রতিদিন একটা কবে বেবুন আমাদের খাণ্ডা যোগান দিতে দেহপাত কবত। উঁচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলেব নানাস্থানে ছোট বড় ঝরণা নেমে এসেচে, সুতবাং জলেব অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে বিপদও ঘটেছিল। একটা ঝরণাব ধাবে ছুপুরবেলা এসে আগুন জ্বলে বেবুনের দাপ্না বল্‌সাবার ব্যবস্থা করচি, জিম্ গিয়ে তৃষ্ণাব ঝোকে ঝরণার জল পান করলে। তার একটু পবেই তার ক্রমাগত বমি হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা। আমি একটা

বিজ্ঞান জ্ঞানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে বরগার জল পরীক্ষা করে দেখি, জলে খনিজ আর্সেনিক মেশানো আছে। ওপর পাহাড়ের আর্সেনিকের স্তর ধুয়ে বরগা নেমে আসচে নিশ্চয়ই। হোমিওপ্যাথিক বাস্তু থেকে প্রতিষেধক ওষুধ দিতে সন্ধ্যার দিকে জিম্ সুস্থ হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে মাঝে ছু একটা বিষধর সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়নি! পাখীর কথা আর প্রজাপতির কথা অবশ্য বাদ দিলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া এত বিচিং বর্ণের ও শ্রেণীর পাখী ও প্রজাপতি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে বন্যজন্তু বলতে যা বোঝায়, তারা সে পর্য্যায় পড়ে না।

প্রথমেই রিহ্টাস্ভেল্ড পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্বত আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু। সেটা পার হয়ে আমরা একটা বিস্তীর্ণ বনময় উপত্যকায় নেমে তাঁবু ফেললাম। একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েচে। নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হোল, এই সব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খনিজদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর নানাদিকে আমরা বালি পরীক্ষা করে বেড়াই, কিছুই কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একটা রেণু পর্য্যন্ত নেই

নদীর বালিতে। আমরা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লাম। তখন প্রায় কুড়ি বাইশ দিন কেটে গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় কফি খেতে খেতে জিম্ বল্লে, দেখ, আমার মন বলচে এখানে আমরা সোনার সন্ধান পাবো। থাকো এখানে আর কিছুদিন।

আরও কুড়িদিন কাটল। বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যন্ত অরুচিকব হয়ে উঠেচে। জিমের মত লোকও হতাশ হয়ে পড়ল। আমি বললাম—আর কেন জিম, চল ফিরি এবার। কাফির গ্রামে আমাদের ঠকিয়েচে। এখানে কিছু নেই।

জিম্ বল্লে—এই পর্বতশ্রেণীর নানা শাখা আছে, সবগুলো না দেখে যাবো না।

একদিন পাগাড়ী নদীটার খাতের ধাবে বসে বালি চালতে চালতে পাথরের বুড়ির রাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত একখানা হল্‌দে রঙের ছোট পাথর আমি ও জিম একসঙ্গেই দেখতে পেলাম। দু'জনেই তাড়াতাড়ি সেটা খুঁড়ে তুললাম। আমাদের মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিম্ বল্লে—ডিয়েগো পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হোল—চিনেচ তো ?

আমিও বুঝেছিলাম। বললাম—হাঁ। কিন্তু নদীস্রোতে ভেসে আসা জিনিষটা। খনিব অস্তিত্ব নেই এখানে।

পাথরখানা দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হল্‌দে রংয়ের হীরকের জাত। অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কাবণ ছিল না, কারণ এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই বিশাল পর্বতশ্রেণীর কোনো অজ্ঞাত, দুর্গম অঞ্চলে হলদে হীরকের খনি আছে।



নদীত্রোতে ভেসে এসেচে তা থেকে একটা স্তরের একটা টুকরো। সে মূল খনি খুঁজে বার করা অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সাহস সাপেক্ষ।

সে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্য্যের অভাব আমাদের ঘটনা, কিন্তু যে দৈত্য ঐ রহস্যময় বনপর্ব্বতের অমূল্য হীরকখনির প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বাধা দিলে।

একদিন আমরা বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম করছি, আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গাতে একটা তাল গাছ, তালগাছের তলায় গুঁড়িটা ঘিরে খুব ঘন বন ঝোপ। হঠাৎ আমরা দেখলাম কিসে যেন অত বড় তালগাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তাব ওপরকারের শুকনো ডালপালাগুলো খড় খড় করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় লাগলে। গাছটাও সেই সঙ্গে নড়চে।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বাতাস নেই কোনোদিকে, অথচ তালগাছটা নড়চে কেন? আমাদের মনে হোল কে যেন তালগাছের গুঁড়িটা ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। জিম্ তখুনি ব্যাপারটা কি দেখতে গুঁড়ির তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো।

সে ওর মধ্যে ঢুকবার অল্পক্ষণ পরেই আমি একটা আর্ন্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেলুম—ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি জিম্ রক্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে আছে—কোন ভীষণ বলবান জন্তুতে তার মুখের সামনে থেকে বুক পর্য্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে কেঁড়ে ফেলেচে—যেমন পুরাণো

বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে, তেমনি। জিম্ শুধু বলে—  
সাক্ষাৎ নয়তান—মূর্ত্তিমান শয়তান—

হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলে—পালাও—পালাও—

তারপরেই জিম্ মারা গেল। তালগাছের গায়ে দেখি যেন কিসের মোটা ও শক্ত চোচ্ লেগে আছে। আমার মনে হোল কোন ভীষণ বলবান জানোয়াব তালগাছের গায়ে গা ঘস্ছিল, গাছটা ও রকম নড়ছিল সেই জন্তেই। জন্তুটার কোনো পাত্তা পেলাম না। জিমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে আমি রাইফেল্ হাতে ঝোপের ওপাবে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মাটির ওপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, তার মোটে তিনটে আঙ্গুল পায়ে—কিছুদূর গেলুম পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা গুহার মুখে পদচিহ্নটা ঢুকে গেল। গুহার প্রবেশ পথের কাছে শুকনা বালিব ওপরে ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড় বড় তিন-আঙ্গুলে থাবার দাগ রয়েছে।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই জনহীন অরণ্যভূমি ও পর্বত বেষ্টিত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা দাঁড়িয়ে আমি এক অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে চেয়ে দেখি প্রায়াক্ষকার সন্ধ্যায় সুউচ্চ ব্যাসার্ণের দেওয়াল খাড়া উঠেচে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে বনে নিবিড়, খুব উঁচুতে পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একটু রাঙা রোদ

—কিন্তু হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের আভা পড়ে থাকবে।

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেচনার কাজ হবে না। জিমের দেহ নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে আগুন জ্বলে রাইফেল তৈরী রেখে বসে রইলুম।

পরদিন জিমকে সমাধিস্থ করে আবার ওই জানোয়ারটার খোঁজে বার হলাম। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সে গুহা এবং সেই তালগাভটা পর্য্যন্ত অনেক খুঁজেও কিছুতেই বার করতে পারলুম না। ও রকম অনেক গুহা আছে পর্ব্বতের নানা জায়গায়। সন্ধ্যার অন্ধকাবে কোন্ গুহা দেখেছিলাম কে জানে ?

সঙ্গীতীন অবস্থায় সেই মহাভূগম রিখটারস্‌ভেল্ড পর্ব্বতশ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না। পনেরো দিন হেঁটে সেই কাফির বসতিতে পৌঁছলাম। তারা চিনতে পারলে, খুব খাতির করলে। তাদের কাছে জিমের মৃত্যু-কাহিনী বল্লুম।

শুনে তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল—ছোট ছোট চোখ ভয়ে বড় হয়ে উঠল। বল্লে—সর্ব্বনাশ! বুনিপ্। ওই ভয়েই ওখানে কেউ যায় না।

কাফির বসতি থেকে আর পাঁচ দিন হেঁটে অরেঞ্জ নদীর ধাবে এসে একখানা ডাচ লঞ্চ পেলাম। তাতে করে এসে সভ্য জগতে পৌঁছলাম।

আমি আর কখনো রিখ্টারস্‌ভেন্ড পর্বতের দিকে যেতে পারিনি। চেষ্টা করেছিলাম অনেক। কিন্তু বুয়র যুদ্ধ এসে পড়ল। যুদ্ধে গেলাম। আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে অনেকদিন রইলাম। তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতদিন ছিলাম।

বছর চার পাঁচ শাস্ত্র জীবন যাপন করবার পরে, ভালো লাগলো না তাই আবার বার হয়েছিলাম। কিন্তু বয়েস হয়ে গিয়েচে অনেক, ইয়্যাংম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরাবে।

এই ম্যাপখানা তুমি রাখো। এতে রিখ্টারস্‌ভেন্ড পর্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেও, বড় মানুষ্য হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু একটা ছোট বড় হীরার খনি বেরিয়েচে। কিন্তু আমরা যেখানে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আল্‌ভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

## পাঁচ

শঙ্করের সেবাসুজ্ঞাবার গুণে ডিয়েগো আলভারেজ সে যাত্রা সেরে উঠল এবং দিন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজেব কাছেই রাখলে। কিন্তু চিরকাল যে পথে পথে বেড়িয়ে এসেচে, ঘবে তার মন বসে না। একদিন সে যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, শঙ্কর নিজের কর্তব্য ঠিক কবে ফেলেছিল। বল্লৈ চল, গোমার অশুখের সময় যে সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? সেই হলদে হীবের খনি?

অশুখের বোঁকে আলভারেজ যে সব কথা বলেছিল, এখন সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে না। বেশীর ভাগ সময় চুপ করে কি যেন ভাবে। শঙ্করের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বল্লৈ—আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখেছি, তা মনে করো না! কিন্তু আলোর পেছনে ছুটবাব সাহস আছে তোমাব?

শঙ্কর বল্লৈ—আছে কি না দেখতে দোষ কি? আজই বলো তো মাভো ষ্টেশনে তার কবে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি। আলভারেজ কিছু ভেবেই বল্লৈ—কব তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখো। যারা সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশী বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায় নি—তবে প্রতিবারই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাবো! আজীবন

অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রসপেকটিং করে বেড়িয়েচে।

আরও দিন দশেক পরে দু'জনে কিসুমু গিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে সীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ান্জার দিকে যাবে ঠিক কবলে।

পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রান্তবে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চবতে দেখে শঙ্কব তো অবাক। এমন দৃশ্য সে আব কখনো দেখে নি। জিবাকগুলো মানুষকে আদৌ ভয় করে না, ৫০ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আলভাবেজ বলল—আফ্রিকার জিরাফ মাঝবার জন্তে গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মাঝবে পারে না। সেজন্তে মানুষকে ওদের তত ভয় নেই।

হরিণের দল কিন্তু বড় ভীক, এক এক দলে ছ'তিন শো হরিণ চবচে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে, তাব পবক্ষণই মাঠের দূর প্রান্তবে দিকে সবাই চাব পা তুলে দৌড়।

কিসুমু থেকে সীমার ছাড়ল—এটা ব্রিটিশ সীমার, ওদের পয়সা নেই বলে ডেকে যাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলে-মেয়ে বেঁধে মৃগী নিয়ে সীমাবে উঠেচে। মাসাই কুলীরা ছুটী নিয়ে দেশে যাচ্ছে—সঙ্গে নাইরোবি সহর থেকে কাঁচের পুঁতি, কম দামেব খেলো আয়না ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস।

ষ্টীমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে। ভিক্টোরিয়া হ্রদের যে বন্দরে ওরা নামলে—তার নাম মোওয়ান্জা—এখান থেকে তিন শো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পৌঁছে কয়েক দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের তীরবর্তী উজ্জি জি বন্দরে।

এই পথে যাবার সময় আলভারেজ্ বল্লে—টাঙ্গানিয়াকার মধ্য দিয়ে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। এখানে এক রকম নাছি আছে, তা কামড়ালে স্লিপিং সিকনেস্ হয়। স্লিপিং সিকনেসের মড়কে টাঙ্গানিয়াকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। মোওয়ান্জা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বেশী। প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকার এই অঞ্চলও ‘সিংহের রাজ্য’ বলা চলে।

সহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের বাংলো। সেখানে এক ইউরোপীয় শিকারী আশ্রয় নিয়েছে। আলভারেজকে সে খুব খাতির করলে। শঙ্করকে দেখে বল্লে—একে পেলে কোথায়? এ তো হিন্দু! তোমার কুলী?

আলভারেজ বল্লে—আমার ছেলে।

সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কি রকম?

আলভাবেজ আনুপূর্ব্বিক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রূষার কথা। কেবল বল্লে না কোথায় যাচ্ছে ও কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

সাহেব হেসে বল্লে—বেশ ভালো। ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুইই আছে। ইষ্ট ইণ্ডিজের হিন্দুরা

লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগাণ্ডাতে একজন শিখ আমার প্রতি এমন সুন্দর আতিথ্য দেখিয়েছিল, তা কখনো ভুলতে পারবো না। আজ তোমরা এসো, রাত সামনে, আমার এখানেই রাত্রি যাপন করো। এটা গবর্ণমেন্টের ডাকবাংলো আমিও তোমাদের মত সারাদিন পথ চলে বিকেলের দিকে এসে উঠি।

সাহেবের একটা ছোট গ্রামোফোন আছে, সন্ধ্যার পরে টিনবন্দী বিলাতী টোমটোর বোল ও সার্ডিন মাছ সহযোগে সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড শুনে যাচ্ছে, এমন সময় অল্প দূরে সিংহের গর্জন শোনা গেল! বোধ হোল, মাটির কাছে মুখ নামিয়ে সিংহ গর্জন করছে—কারণ মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সাহেব বল্লে—টাঙ্গানিয়াকায় বেজায় সিংহের উপদ্রব। আর বড় হিংস্র এরা। প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষকে। মানুষের রক্তের আশ্বাদ একবার পেয়েচে, এখন মানুষ ছাড়া আর কিছু চায় না।

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ইউগাণ্ডা রেলওয়ে তৈরী হবার সময়ে সে সিংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালই দেখেচে।

পরদিন সকালে ওরা আবার বওনা হোল, সাহেব বলে দিলে সূর্য্য উঠে গেলে খুব সাবধান থাক্ ব। স্লুপিং সিক্‌নেসের মাছি রোদ উঠলেই জাগে। গায়ে যেন না বসে।



দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে শূঁড়িপথ। আলভারেজ বল্লে—খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের আড্ডা। বেশী পেছনে থেকে না।

আলভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা। আর একটা ভরসা এই যে আলভারেজ, যাকে বলে ‘ক্র্যাঙ্ক শট’, তাই। অর্থাৎ তাব গুলি বড় একটা ফস্কাই না। কিন্তু অত বড় অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারী সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে না, কারণ ইউগাণ্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, সিংহ যখন যাকে নেবে, এমন সম্পূর্ণ অতর্কিতেই নেবে, যে পিঠের রাইফেলের চামড়ার ঝুঁপ-খুলবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দূরবিস্তার প্রান্তরের মধ্যে, রাত্রে বিশ্রামেব জগ্নে স্থান নির্বাচন করে নিতে হোল। আলভারেজ বল্লে—সামনে কোন গ্রাম নেই—অন্ধকারের পর এখানে পথ চলা ঠিক নয়।

একটা সুবৃহৎ বাওবাব গাছের তলায় দু টুকরো কেবিন্সে ঝুলিয়ে ছোট একটা তাঁবু খাটানো হোল। কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জালিয়ে রাত্রে খাবার তৈরী করতে বসল শঙ্কর। তারপর সমস্তদিন পরিশ্রমের পরে দুজনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে আলভারেজ ডাকলে—শঙ্কর, ওঠো।

শঙ্কর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

আলভারেজ বল্লে—কি এটা জানোয়ার তাঁবুর চারিপাশে ঘুরচে—বন্দুক বাগিয়ে রাখো।

সত্যিই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ তাঁবুর পাংলা কেন্সিসের পর্দার বাইরেই শোনা যাচ্ছে বটে। তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়েছিল—তার স্বল্পাবশিষ্ট আলোকে সুবৃহৎ বাওবাব গাছটা একটা ভীষণদর্শন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে।

পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দার ভেতর থেকেই আলভারেজ পর পর ছুবার রাইফেল ছুঁড়লে। শব্দটা লক্ষ্য করে শঙ্করও সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু শঙ্কর ঘোড়া টিপবার আগে আলভারেজের রাইফেল আর একবার আওয়াজ করে উঠল।

তার পরেই সব চুপ।

ওরা টর্চ জ্বলে সম্ভরণে তাঁবুর বাইরে এসে দেখলে তাঁবুর পূর্বদিকের পর্দার বাইরে পর্দাটা খানিকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ।

সেটা তখনও মরেনি, কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। আরও ছুবার গুলি খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বসে—রাত এখনো অনেক। ওটা এখানে পড়ে থাক্। চলো আমরা আমাদের ঘুম শেষ করি।

হুজনেই এসে গুয়ে পড়ল—একটু পরে শঙ্কর বিশ্বয়ের সঙ্গে

লক্ষ্য করলে আলভারেজের নাসিকা গর্জ্জন শুরু হয়েছে। শঙ্করের চোখে ঘুম এল না।

আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হোল, আলভাবেজের নাসিকা-গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্তে টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলের সমস্ত সিংহ যেন এক যোগে ডেকে উঠল। সে কি ভয়ানক সিংহের ডাক।...আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহ-গর্জ্জন শুনেচে, কিন্তু এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জ্জন তার চিরকাল মনে ছিল। তা ছাড়া ডাক তাঁবু থেকে বিশ হাতের মধ্যে।

আলভারেজ আবার জেগে উঠল। বল্লে—নাঃ, বাত্রে দেখচি একটু ঘুমুতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধান থাকো। বড় পাজী জানোয়ার।

কি দুর্ঘ্যোগের রাত্রি! তাঁবুর আগুনও তখন নিবু নিবু। তায় বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাতলা কেশিসের চটের মাত্র ব্যবধান—তাব ওদিকে সাথীহাবা পশু। বিরাট গর্জ্জন করতে করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূবে যায়, আবার কাছে আসে, কখনও তাঁবু প্রদক্ষিণ করে।

ভোর হবাব কিছু আগে সিংহটা সরে পড়ল। ওরাও তাঁবু তুলে আবার যাত্রা শুরু করলে।

## ছদ্ম

দিন পনেরো পরে শঙ্কর ও আলভারেজ্, উজিজি বন্দর থেকে ষ্টীমারে টাঙ্গানিয়াকা হ্রদের বক্ষে ভাসল। হ্রদ পার হয়ে আলবার্টভিল্ বলে একটা ছোট সহরে কিছু আবশ্যকীয় জিনিষ কিনে নিল। এই সহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলজিয়ম গবর্ণমেন্টের রেলপথ আছে। সেখান থেকে কঙ্গো নদীতে ষ্টীমারে চড়ে তিনদিনের পথ সান্‌কিনি যেতে হবে, সান্‌কিনি নেমে কঙ্গোনদীর পথ ছেড়ে, দক্ষিণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও অরুভূমির দেশে প্রবেশ করতে হবে।

কাবালো অতি অপরিষ্কার স্থান, কতকগুলো বর্ণসঙ্কর পটু'গিজ ও বেলজিয়ানের আড্ডা।

ষ্টেশনের বাইরে পা দিয়েচে এমন সময় একজন পটু'গিজ ওর কাছে এসে বল্লে—হ্যালো, কোথায় যাবে ? দেখচি নতুন লোক, আমায় চেন না নিশ্চয়ই। আমার নাম আলবুকার্ক।

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আলভারেজ তখনও ষ্টেশনের মধ্যে।

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ, তেমনি কদাকার। কিন্তু সে ভীষণ জোয়ান, প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশী গুণে নেওয়া যায়, এমনি সুদৃঢ় ও সুগঠিত শঙ্কর বল্লে—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।

লোকটা বল্লে—তুমি দেখচি কালা আদমি, বোধহয় ইষ্ট ইণ্ডিজের। আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চলো।

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটেছিল, বললে—তোমার সঙ্গে পোকার খেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে চায়। পোকার একরকম তাসের জুয়াখেলা—শঙ্কর নাম জানলেও সে খেলা কখনো জীবনে দেখেও নি, নাইরোবিতে সে জানতো বদমাইস জুয়াড়ীরা পোকার খেলার ছল করে নতুন লোকের সর্বনাশ করে। এটা এক ধরনের ডাকাতি।

শঙ্করের উত্তর শুনে পটুগিজ বদমাইসটা রেগে লাল হয়ে উঠল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরতে চাইল। সে আরও কাছে ঘেঁসে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, অতি বিকৃত স্বরে বললে—কি? নিগার, কি বলি? ইষ্ট ইণ্ডিজের তুলনায় তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখচি! তোর ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্তে তোকে জানিয়ে দিই যে, তোর মত কালা আদমিকে আলবুকার্ক এই রিভলভারের গুলিতে কাঁদাখোঁচা পাখীর মত ডজনে ডজনে মেরেচে। আমার নিয়ম হচ্ছে এই শোন। কাবালোতে যারা নতুন লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার খেলবে, নয়তো আমার সঙ্গে রিভলভারে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে।

শঙ্কর দেখলে এই বদমাইস লোকটার সঙ্গে রিভলভারের লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অনিবার্য। বদমাইসটা হচ্ছে একজন ক্র্যাক-শট গুণ্ডা, আর সে কি? কাল পর্য্যন্ত রেলের নিরীহ কেরাণী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করে যদি পোকারই খেলে তবে সর্বস্ব বাবে।

হয়তো আধমিনিট কাল শঙ্করের দেবী হয়েচে উত্তর দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলষ্টার থেকে নিমেষের মধ্যে রিভলভার বার করে শঙ্করের পেটের কাছে উচিয়ে বলে—যুদ্ধ না পোকার ?

শঙ্করের মাথায় রক্ত উঠে গেল। ভীকর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, হোক মৃত্যু।

সে বলতে যাচ্ছে—যুদ্ধ, এমন সময়ে পেছন থেকে ভয়ানক বাঁজখাই শুরে কে বলে—এই ! সামুলাও, গুলিতে মাথার চাঁদি উড়ল ! দুজনেই চমকে উঠে পেছনে চাইলে। আলভারেজ তার উইন্চেষ্টার রিপিটারটা বাগিয়ে উচিয়ে পটু'গিজ বদমাইসটার মাথা লক্ষ্য করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর সুযোগ বুঝে চট করে পিস্তলের নলের উণ্টোদিকে ঘুরে গেল। আলভারেজ বলে—বালকের সঙ্গে রিভলভার ডুয়েল ? ছাঃ, তিন বলতে পিস্তল ফেলে দিবি—এক,—দুই,—তিন—আলবুকার্কেব শিথিল গাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল।

আলভারেজ বলে—বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি-না ? শঙ্কর ততক্ষণ পিস্তলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েচে। আলবুকার্ক একটু বিস্মিত হোল, আলভারেজ যে শঙ্করের দলের লোক, তা সে ভাবেও নি। সে হেসে বলে—আচ্ছা, মেট, কিছু মনে কোরো না, আমারই হার। দাও, আমার পিস্তলটা দাও ছোকরা। কোনো ভয় নেই, দাও।

এসো হাতে হাত দাও। তুমিও মেট। আলবুকার্ক রাগ পুষে রাখে না। এসো, কাছেই আমার কেবিন, এক এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে যাও।

আল্‌ভারেজ নিজের জাতের লোকের রক্ত চেনে। ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে আলবুকার্কের কেবিনে গেল। শঙ্কর বিয়ার খায় না শুনে তাকে কফি করে দিলে। প্রাণ খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয় নি।

শঙ্কর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হোল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা যে এমন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমনি ধারা দিল-খোলা হেসে খোসগল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরণের লোক বেশী নেই।

পরদিন ওরা কাবালো থেকে ষ্টিমারে উঠল কঙ্গোনদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে যাবার জন্তে। নদীর দুই তীরের দৃশ্যে শঙ্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এ রকম অদ্ভুত বনজঙ্গলের দৃশ্য জীবনে কখনো সে দেখেনি। এতদিন সে যেখানে ছিল, আফ্রিকার সে অঞ্চলে এমন বন নেই — সে শুধু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানতঃ ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গোনদী বেয়ে ষ্টিমার যত অগ্রসর হয়, ততধারে নিবিড় বনানী, কত ধরণের মোটা মোটা

লতা, বনের ফুল, বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্য্য ও নিবিড় প্রাচুর্য্যে আপনি মুগ্ধ।

শঙ্করের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ভাবুক মনটী ছিল, (হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্ভারেজের মত শুধু কঠিন প্রাণ স্বর্ণাশ্রয়ী প্রস্বেপ্তের নয়) এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্নে ও ছপুর রোদে আপন মনে কত কি স্বপ্নজাল রচনা করে।

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃতি তখন যেন জেগে উঠেচে—জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে আসে, শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্য্যস্বপ্নে ভোর হয়ে, মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।

ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল—আকাশে অনেকদূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেচে, ওই রকম এক ফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সে সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে এসে সে পড়েচে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?

হুদিন পরে বোট এসে সান্‌কিনি পৌঁছুলো। সেখান থেকে ওরা আবার পদব্রজে রওনা হোল—জঙ্গল এদিকে বেশী নেই, কিন্তু দিগন্তপ্রসারী জনমানবহীন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় পাহাড়, অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও বৃক্ষশূন্য, কোনো



কোনো পাহাড়ে ইউফোর্বিয়া জাতীয় গাছের ঝোপ। কিন্তু শঙ্করের মনে হোল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ। এতটা কাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সূর্য্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এই দেশকে রাত্রে, অপরাহ্নে রূপ-কথার পরীরাজ্য করে তোলে।

আলভারেজ্ বলে—এই ভেল্ড্ অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী।

কথাটা যেদিন বলা হোল, সেদিনই এক কাণ্ড ঘটল। জনহীন ভেল্ডে সূর্য্য অস্ত গেল ওরা একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বাললে—শঙ্কর জল খুঁজতে বেরুল। সঙ্গে আলভারেজেব বন্ধুকে নিয়ে গেল, কিন্তু মাত্র দুটো টোটা। আধঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেলাটুকু গেল, পাংলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে ধীরে আবৃত করে দিলে। শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধঘণ্টার বেশী হাঁটেনি। হঠাৎ চারিধারে চেয়ে শঙ্করের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হোল, যেন কি একটা বিপদ আসছে, তাঁবুতে ফেরা ভালো। দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে সব দিক, কোনো চিহ্ন নেই, সব একাকার!

মিনিট পাঁচ ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হোল সে পথ হারিয়েছে। তখন আলভারেজেব কথা তার মনে পড়ল। কিন্তু তখনও সে অনভিজ্ঞতার দরুণ বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না। হেঁটেই যাচ্ছে, হেঁটেই যাচ্ছে—একবার মনে হয়

সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় ডাইনে।  
তাঁবুর আগুনের কুণ্ডটা দেখা যায় না কেন? কোথায় সেই  
ছোট পাহাড়টা?

ছ'ঘণ্টা হাঁটবার পরে শঙ্করের খুব ভয় হোল। ততক্ষণে  
সে বুঝেচে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েচে এবং ভয়ানক  
বিপদগ্রস্ত। একা তাকে রোডেসিয়ার এই জনমানবশূন্য,  
সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে,—অনাহারে  
এবং এই কনকনে শীতে বিনা কপ্তলে ও বিনা আগুনে। সঙ্গে  
একটা দেশলাই পর্য্যন্ত নেই।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে, পরদিন সন্ধ্যার  
পূর্ব্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চব্বিশ ঘণ্টা পরে উদ্ভ্রান্ত তৃষ্ণায়  
মুগ্ধ শঙ্করকে, ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে,  
একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে আল্ভারেজ উদ্ধার করে  
তাঁবুতে নিয়ে এল।

আল্ভারেজ বল্লে—তুমি যে পথ ধরেছিলে শঙ্কর, তোমাকে  
আজ খুঁজে বার করতে না পারলে তুমি গভীর থেকে গভীরতর  
মরুপ্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, কাল ছপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ  
হারাতে। এর আগে তোমার মত অনেকেই রোডেসিয়ার  
ভেঙ্গে এ ভাবে মারা গিয়েচে। এ সব ভয়ানক জায়গা। তুমি  
আর কখনও তাঁবু থেকে ও রকম বেরিও না, কারণ তুমি  
আনাড়ি। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই।  
ডাঁহা মারা পড়বে।

শঙ্কর বললে—আলভারেজ, তুমি ছুঁবার আমার প্রাণ রক্ষা করলে, এ আমি ভুলবো না।

আলভারেজ বললে—ইয়াং ম্যান, ভুলে যাচ্ছ যে তার আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ইউগাণ্ডার তৃণভূমিতে আমার হাড়গুলো শাদা হয়ে আসতো এতদিন।

মাস দুই ধরে রোডেসিয়া ও এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে, অবশেষে দূরে মেঘের মত পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। আলভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বলল—ওই হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থান, রিখটারস্ভেল্ড পর্বত, এখনও এখান থেকে চল্লিশ মাইল হবে। আফ্রিকাব এই সব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়।

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় ভাল লাগে—দূর থেকে যেন মনে হয় বট কি অশ্বথ গাছের মত কিন্তু কাছে গেলে দেখা যায়, বাওবাব গাছ ছায়াবিবল অথচ বিশাল, আঁকা বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব্ বেরিয়েচে, যেন আববা উপত্যাসেব একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুজ্জ দৈত্য। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এখানে ওখানে প্রায় সর্বত্রই দূরে নিকটে বড় বড় বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে।

একদিন সন্ধ্যাবেলার দুর্জয় শীতে তাঁবুর সামনে আগুন করে বসে আলভারেজ বললে—এই যে দেখ্চ রোডেসিয়ার ভেল্ড অঞ্চল, এখানে হীরে ছড়ানো আছে সর্বত্র, এটা হীরের খনির দেশ। কিম্বার্লি খনির নাম নিশ্চয়ই শুনেচ। আরও

অনেক ছোট খাটো খনি আছে, এখানে ওখানে ছোট বড় হীরের টুকরো কত লোকে পেয়েচে, এখনও পায়।

কথা শেষ করেই বলে উঠল—ও কারা ?

শঙ্কর সামনে বসে ওর কথা শুনছিল ! বল্লে, কোথায় কে ?

কিন্তু আল্ভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকেব গুলিব মতই অব্যর্থ, একটু পনে তাঁবু থেকে দূবে অন্ধকারে কয়েকটা অস্পষ্ট মূর্তি এদিকে এগিয়ে আসচে, শঙ্করের চোখে পড়ল। আল্ভাবেজ বল্লে—শঙ্কর, বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে—

বন্দুক হাতে শঙ্কর বাইরে এসে দেখলে,

আলভাবেজ্ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করচে, কিছুদূবে অজানা মূর্তি কয়টা এখনও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসচে। একটু পরে তারা এসে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়ালো। শঙ্কর চেয়ে দেখলে আগন্তুক কয়েকটা কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়,—তাদের হাতে কিছু নেই, পরণে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—



শুগঠিত চেহারা, তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কয়েকটা  
ব্রোঞ্জের মূর্তি।

আল্ভারেজ জুলু ভাষায় বল্লে—কি চাও তোমরা ?

ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা চল্লে, তার পরে ওরা সব মাটির  
ওপর বসে পড়ল ; আল্ভারেজ বল্লে—শঙ্কর ওদের খেতে দাও—

তারপরে অল্পক্ষণে বল্লে—বড় বিপদ। খুব ছুঁসিয়ার,  
শঙ্কর।

টিনের খাবার খোলা হোল। সকলের সামনেই খাবার  
রাখলে শঙ্কর। আল্ভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বস্লে,  
যদিও সে ও শঙ্কর সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ আহার শেষ  
করেচে। শঙ্কর বুঝলে আল্ভারেজের কোন মতলব আছে,  
কিংবা এদেশের রীতি অতিথির সঙ্গে খেতে হয়।

আল্ভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে  
গল্প করচে, অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষ করে ওরা চলে গেল।  
চলে যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট  
দেওয়া হোল।

ওরা চলে গেলে আল্ভারেজ বল্লে—ওরা মাটাবেল্ জাতির  
লোক। ভয়ানক হৃদ্যন্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে অনেকবার  
লড়েচে। সয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেচে  
আমরা ওদের দেশে এসেচি হীরের খনির সন্ধানে। আমরা  
যে জায়গাটায় আছি, এটা ওদের একজন সর্দারের রাজ্য।  
কোনো সভ্য গবর্ণমেন্টের আইন এখানে খাটবে না। ধরবে

আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। চলো আমরা তাঁবু তুলে ,  
রওনা হই।

শঙ্কর বল্লে—তবে তুমি বন্দুক আনতে বল্লে কেন ?

আলভারেজ হেসে বল্লে—দেখো, ভেবেছিলুম যদি ওরা  
খেয়েও না ভোলে, কিংবা কথাবার্তায় বুঝতে পারি যে, ওদের  
মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুলি করবো।  
এই ছাখো রিভলভার পেছনে রেখে তবে গেতে বসেছিলাম।  
একটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আলভারেজ্  
অমিও একসময়ে সয়তানকেও ভয় করতুম না, এখনও করিনে।  
ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছোবার আগেই আমার পিস্তলের  
গুলি ওদের মাথাব খুলি উড়িয়ে দিত।

আরও পাঁচ ছাঁদিন পথ চলবার পরে একটা খুব বড়  
পর্বতের পাদমূলের নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওবা  
প্রবেশ করলে। স্থানটী যেমন নির্জন, তেমনি বিশাল। সে  
বন দেখে শঙ্করের মনে হোল, একবার যদি সে এর মধ্যে পথ  
হারায়, সারাজীবন ঘুবলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার  
হবে না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দি়ে বল্লে—  
খুব ছাঁসিয়ার শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে  
পদে পদে এই সব বনে পথ হারাবে। অনেক লোক বেঘোরে  
পড়ে বনের মধ্যে মারা পড়ে। মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ  
হারিয়ে ঘুরেছিলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনিই পথ হারাতে  
পারো। কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর

এক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো চিহ্ন নেই। ভাল বুশ্‌ম্যান না হোলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। বন্দুক না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটীও যেন মনে থাকে। মধ্য আফ্রিকার বন সৌখীন ভ্রমণের পার্ক নয়।

শঙ্করকে তা না বললেও চলতো, কারণ এ সব অঞ্চল যে সখেব পার্ক নয়, তা এর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেচে। সে জিজ্ঞেস করলে—তোমার সেট হলদে হীরের খনি কতদূরে? এই তো রিখ্টারস্‌ভেন্ড্‌ পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে।

আলভারেজ হেসে বললে—তোমার ধারণা নেই বল্লাম যে। আসল রিখ্টারস্‌ভেন্ডের এটা বাইবের থাক্। এ রকম আরও অনেক থাক্ আছে। সমস্ত অঞ্চলটা এত বিশাল যে পূবে সত্তর মাইল ও পশ্চিমদিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্য্যন্ত গেলেও এ বন ও পাহাড় শেষ হবে না। সর্ব্ব নিম্ন প্রস্থ চল্লিশ মাইল। সমস্ত জড়িয়ে আট ন' হাজার বর্গ মাইল সমস্ত রিখ্টারস্‌ভেন্ড্‌ পার্বত্য অঞ্চল ও অবণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোন্‌ খানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে, ঠিক সে জায়গাটা খুঁজে বার করা কি ছেলেখেলা, ইয়্যাং ম্যান্‌?

শঙ্কর বললে—এদিকে খাবার ফুরিয়েচে, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ুভক্ষণ ছাড়া উপায় নেই।

আলভারেজ বললে—কিছু ভেবো না। দেখচো না গাছে

গাছে বেবুনের মেলা ? কিছু না মেলে বেবুনের দাপ্না ভাজা আর কফি দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট খাবো কাল থেকে । আজ আর নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক ।

একটা বড় গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালালে । শঙ্কর রান্না করলে, আহািাদি শেষ করে যখন দুজনে আগুনের সামনে বসেচে, তখনও বেলা আছে ।

আলভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে টানতে বল্লে—  
জানো, শঙ্কর, আফ্রিকার এই সব অজানা অরণ্যে এখনও কত জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না ? খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেচে । ওকাপি বলে যে জানোয়ার সে তো প্রথম দেখা গেল ১৯০০ সালে । এক ধরনের বুনো শৃগুর আছে, যা সাধারণ বুনো শৃগুরের প্রায় তিনগুণ বড় আকাবে । ১৮৮৮ সালে মোজেস্ কাউলে, পৃথিবী পর্য্যটক ও বড় শিকারী, সর্বপ্রথম ওই বুনো শৃগুরের সন্ধান পান বেলজিয়াম কঙ্গোর লুয়ালাবু অরণ্যের মধ্যে । তিনি বহু কষ্টে একটা শিকাবও কবেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবিজ্ঞা সংক্রান্ত মিউজিয়মে উপহার দেন । বিখ্যাত রোডেসিয়ান্ মন্টগারের নাম শুনেচ ?

শঙ্কর বলে—না, কি সেটা ?

—শোনো তবে । রোডেসিয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড জলাভূমি আছে । ওদেশের অসভ্য জুলুদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূমিতে মাঝে মাঝে



দেখেচে। ওরা বলে তার মাথা কুমীরের মত, গণ্ডারের মত তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মত লম্বা ও আঁসওয়ালা দেহটা জল হস্তীর মত, লেজটা কুমীরের মত। বিরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকৃতিও খুব হিংস্র। জল ছাড়া কখনো ডাঙায় এ জানোয়ারকে দেখা যায় নি। তবে এই সব অসভ্য দেশী লোকের অতিরঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু ১৮৮০ সালে জেম্‌স্‌ মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর রোডেসিয়ার এই অঞ্চলে বহুদিন ঘুরেছিলেন সোণার সন্ধানে। মিঃ মার্টিন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এডিকং ছিলেন, নিজে একজন ভালো ভূতত্ত্ব ও প্রাগীতত্ত্ববিদও ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরীর মধ্যে রোডেসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর থেকে দেখেচেন বলে উল্লেখ কবে গিয়েচেন। তিনিও বলেন, জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসর জাতীয় সবীশপের মত ও বেজায় বড়। কিন্তু তিনি জোর করে কিছু বলতে পারেন নি, কারণ খুব ভোরের কুয়াসার মধ্যে কোভিরাণ্ডো হ্রদের সীমানায় জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে তিনি জানোয়ারটাকে দেখেছিলেন। জানোয়ারটার ঘোড়ার চিঁহি ডাকের মত ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গে জুলু চাকরগুলো উর্দ্ধস্থানে পালাতে পালাতে বল্লে—মাহেব পালাও, পালাও, ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্! ডিঙ্গোনেক্! এই জানোয়ারটার জুলু নাম। ছুঁতিন বছরে এক আধবার দেখা দেয় কি না দেয়, কিন্তু সেটা এতই হিংস্র যে, তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের পক্ষে

ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। মিঃ মার্টিন বলেন, তিনি তাঁর ৩০৩ টোটা গোট্টা দুই উপরি উপরি ছুঁড়েছিলেন জানোয়ারটার দিকে। অতদূর থেকে তাক হোল না, রাইফেলের আওয়াজে সেটা সম্ভবতঃ জলে ডুব দিলে।

শঙ্কর বল্লে—তুমি কি করে জানলে এ সব? মার্টিনের ডায়েরী ছাপানো হয়েছিল নাকি?

—না, অনেকদিন আগে বুলাওয়েও ক্রণিক্ল কাগজে মিঃ মার্টিনের এই ঘটনাটা বেরিয়েছিল। আমি তখন সবে এদেশে এসেছি। রোডেসিয়া অঞ্চলে আমিও প্রস্পেক্টিং করে বেড়াতুম বলে জানোয়ারটার বিবরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। কাগজখানা অনেকদিন আমার কাছে রেখেও দিয়েছিলুম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল। ওরাই নাম দিয়েছিল জানোয়ারটার রোডেসিয়ান্ মনষ্টার।

শঙ্কর বল্লে, তুমি কোনো কিছু অদ্ভুত জানোয়ার দেখোনি?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেচে। সেই আবছায়া আলো অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করের মনে হোল—হয়তো শঙ্করের ভুল হতে পারে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয় সে দেখলে আল্ভারেজ, দুর্ক্ব ও নিভীক আল্ভারেজ, দুঁদে ও অব্যর্থলক্ষ্য আলভারেজ, ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো—এবং—এবং সেইটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য—যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আল্ভারেজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই চারি

পাশের জনমানবহীন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা ছুরারোহ পর্বত-  
মালার দিকে একবার চেয়ে দেখলে কোন কথা বললে না।  
যেন এই পর্বতজঙ্গলে বছকাল পরে এসে অতীতের কোনো  
বিভীষিকাময়ী পুরাতন ঘটনা এর স্মৃতিতে ভেসে উঠেচে—  
যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়।

আল্ভারেজ ভয় পেয়েচে !

অবাক্ ! আল্ভারেজের ভয় ! শঙ্কর ভাবতেও পারে না !  
কিন্তু সেই ভয়টা অলক্ষিতে এসে শঙ্করের মনেও চেপে বসলো।  
এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্বত  
প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে  
আস্চে—যে বীর হও, যে নিভীক হও, এগিয়ে এসো সে—কিন্তু  
মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখটারস্-  
ভেল্ড পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবাত্মা নাগাধিরাজ হিমালয়  
নয়—এদেশের মাসাই জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির  
মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসোলুপ। সে কাউকে  
রেহাই দেবে না।

## সাত

তারপর দিন দুই কেটে গেল। ওরা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে। পথ কোথাও সমতল নয়, কেবল চড়াই আর উৎরাই, মাঝে মাঝে কর্কশ ও দীর্ঘ টুসক ঘাসের বন, জল প্রায় দুপ্রাপ্য, বরুণা এক আধটা যদিও বা দেখা যায়, আল্ভারেজ্ তাদের জল ছুঁতেও দেয় না। দিবিয় স্ফটিকের মত নির্মল জল পড়চে বরুণা বেয়ে, শুশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন—কিন্তু আল্ভারেজ্ জলের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে না। জলের তৃষ্ণা ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্ণার কষ্টই সব চেয়ে বেশী কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল শঙ্করের। একস্থানে টুসক ঘাসের বন বেজায় ঘন। তার ওপরে ওদেব চাবিধাব ঘিবে সেদিন কুয়াসাও খুব গভীর। হঠাৎ বেলা উঠলে নীচের কুয়াসা সরে গেল—সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হোল, খুব বড় একটা চড়াই তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে, কত উঁচু সেটা তা জানা সম্ভব নয়, কারণ নিবিড় কুয়াসা কিংবা মেঘে তাব ওপরের দিকটা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। আল্ভারেজ্ বললে—রিখ্টারম্ভেন্ডের আসল রেঞ্জ।

শঙ্কর বললে—এটা পার হওয়া কি দরকার ?

আল্ভারেজ্ বললে—এইজন্তে দরকার যে সেবার আমি আর জিম দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিলুম এই পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে কিন্তু আসল রেঞ্জ পার হইনি। যে নদীর ধারে হুলদে হীরে

পাওয়া গিয়েছিল, তাঁর গতি পূব থেকে পশ্চিমে। এবার আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দক্ষিণে সুতরাং পর্বত পার হয়ে ওপারে না গেলে কি করে সেই নদীটার ঠিকানা করতে পারি।

শঙ্কর বললে—আজ যে রকম কুয়াসা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন? আর একটু বেলা বাড়ুক।

তাঁবু ফেলে আহাতি সম্পন্ন করা হোল। বেলা বাড়লেও কুয়াসা তেমন কাটল না। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে। ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই। চোখ মুছতে মুছতে তাঁবুর বাইরে এসে সে দেখলে আল্ভারেজ চিস্তিত-মুখে মাপ খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে—শঙ্কর, আমাদের এখনও অনেক ভ্রুগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ।

আল্ভারেজের কথার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই এক গম্ভীর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল। কুয়াসা কখন কেটে গেছে, তার সামনে বিশাল রিখটারম্ভেন্ড পর্বতের প্রধান থাক্ ধাপে ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেচে। পাহাড়ের কটিদেশ নিবিড় বিহুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জে আবৃত কিন্তু উচ্চতম শিখররাজি অস্ত্রমান সূর্যের রাঙা আলোয় দেবালোকের কনকদেউলের মত বহুদূর নীল শূণ্ণে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু সামনেব পর্বতাংশ সম্পূর্ণ ছুরারোহ—শুধুই খাড়া খাড়া উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—কোথাও একটু ঢালু নেই। আল্ভারেজ

বল্লে—এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর। দেখেই বুঝেচ নিশ্চয়। পাহাড়ের কোলে কোলে পশ্চিম দিকে চল। যেখানে ঢালু এবং নীচু পাবো, সেখান দিয়েই পাহাড় পার হতে হবে। কিন্তু এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কোথায় সে রকম জায়গা আছে, এ খুঁজতেই তো এক মাসের ওপর যাবে দেখ'চি।

কিন্তু দিন পাঁচ ছয় পশ্চিম দিকে যাওয়াব পবে এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল, যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢালু, সেখান দিয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে।

পরদিন খুব সকাল থেকে পর্বতাবোহণ শুরু হোল। শঙ্করের ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে ছাঁটা। সাড়ে আটটা বাজতে আব না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে যায়গাটা দিয়ে তারা উঠ'চে—সেখানে পর্বতের খাড়াই চাব মাইলের মধ্যে উঠেচে ছ'হাজার ফুট, সুতরাং পথটা ঢালু হোলেও কি ভীষণ ছুরারোহ তা সহজেই বোঝা যাবে। তা ছাড়া যতই ওপরে উঠ'চে, অরণ্য ততই নিবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারিদিক, বেলা হয়েচে, রোদ উঠেচে, অথচ সূর্য্যের আলো ঢোকে নি জঙ্গলের মধ্যে—আকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্য্যের আলো।

পথ বলে কোনো জিনিস নেই। চোখেব সামনে শুধুই গাছের গুঁড়ি যেন ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেচে। কোথা থেকে জল পড়েচে কে জানে, পায়ের নীচের প্রস্তুত আর্জ

ও পিচ্ছিল, প্রায় সর্বত্রই পাথরের ওপর শেওলা-ধরা। পা পিছলে গেলে গড়িয়ে নীচের দিকে বহুদূর চলে গিয়ে তাক্স শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে।

শঙ্কর বা আলভারেজ কারো মুখে কথা নেই। এই উত্তর পথে উঠবার কষ্টে ছ'জনেই অবসন্ন, ছ'জনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়চে। শঙ্করের কষ্ট আরও বেশী, বাংলার সমতল ভূমিতে আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো।

শঙ্কর ভাবচে, আলভারেজ কখন বিশ্রাম করতে বলবে? সে আর উঠতে পারচে না, কিন্তু যদি সে মরেও যায়, একথা আলভারেজকে সে কখনই বলবে না, যে সে আর পারচে না। হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে, ইষ্ট্ ইণ্ডিজের মানুষগুলো দেখ'চি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি—এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।

বড় চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝরণা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখী চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় শাদা শাদা ফুল, অর্কিডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, গুঁড়ি গায়ে।

হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে মাঝে লম্বা দাড়ি গোঁপওয়ালা বালখিল্য মুনিদের মত ও কারা বসে

দেয়চে। তারা সবাই চুপচাপ বসে, মুনিজ্ঞনোচিত গান্ধীর্যে ভরা। ব্যাপার কি ?

আল্ভারেজ বলে—ও কলোবাস্ জাতীয় মাদী বানর। পুরুষ জাতীয় কলোবাস্ বানরের দাড়ী গোঁফ নেই, স্ত্রী জাতীয় কলোবাস্ বানরের হাতখানেক দীর্ঘ দাড়ী গোঁফ গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ্চ।

ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন।

পায়ের তলায় মাটীও নেই, পাথরও নেই—তাদের বদলে আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গুঁড়ির স্তূপ। এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি ঝরেচে, পচে যাচ্ছে, তার ওপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠছে, ছাতা গজাচ্ছে, তার ওপরে আবার নতুন-বরা পাতার রাশি, আবার পড়ছে গাছের ডাল-পালা, গুঁড়ি। জায়গায় জায়গায় ঘাট সত্তর ফুট গভীর হয়ে জমে রয়েছে এই পত্র স্তূপ।

আল্ভারেজ ওকে শিখিয়ে দিলে, এ সব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে। এমন জায়গা আছে, যেখানে মানুষে চলতে চলতে ওই ঝবা পাতার বাশির মধ্যে ভুস্ করে ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন অতর্কিতে পথ চলতে চলতে প্রাচীন কূপের মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে সে সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু অনিবার্য।

শঙ্কর বলে—পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা যাচ্ছে না, বড় ঘন হয়ে উঠছে।



ক্ষুরের মত ধারাল চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন—( ২. রোমান যুগের দ্বিধার তলোয়ার। তার মধ্যে দিয়ে যাঁধার সময় দু'জনের কেহই নিরাপদ বলে ভাবচে না নিজেকে, ৭ গত তফাতে কি আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম বিপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে। থাকতে পারে বাঘ, থাকতে পারে সিংহ, থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ।

শঙ্কর লক্ষ্য করচে মাঝে মাঝে ডুগুগুগি বা ঢোল বাজনার মত একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন বনের মধ্যে। কোনো অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাকি? আল্ভারেজকে সে জিগ্যেস করলে

আলভারেজ বললে—ঢোল নয়, বড় বেবুন কিংবা বনমানুষে বুক চাপড়ে ওই রকম শব্দ করে। মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

শঙ্কর বললে—তুমি যে বলেছিলে এ বনে গরিলা নেই?

—গরিলা সম্ভবতঃ নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেল্জিয়ান কঙ্গোর কিভু অঞ্চল, রাওয়েন্জরী আল্পস বা ভিক্টোরিয়া আগ্নেয় পর্বতের অরণ্য ছাঁড়া অথবা কোথাও গরিলা আছে বলে তো জানা নেই। গরিলা ছাড়াও অথবা ধরণের বনমানুষে বুক চাপড়ে ও রকম আওয়াজ করতে পারে।

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের ওপর উঠেচে। সেদিনেব মত সেখানেই রাত্রির বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলা হোল। একটা বিশাল সত্যিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের রাত্রিকালীন শব্দ

এত বিচিত্র ধরণের ও এত ভীতিজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় মিশ্রিত একটা বিষয়।

কত রকমের শব্দ—হায়েনার হাসি, কলোবাস্ বানবের কর্কশ চীৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক—প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গভীর রাত্রে যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে। বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সার্কাসের দল এসে ওদের স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল, তাদের জানোয়াবদের চীৎকারে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা রাত্রে ঘুমতে পারতো না—শঙ্করের সেই কথা এখন মনে পড়ল। কিন্তু এ সবের চেয়েও মধ্যরাত্রে একদল বন্য হস্তীর বৃহতী ধ্বনি তাঁবুর অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে গেল যে, আলভাবেজকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠালে। আলভাবেজ বললে—আগুন জ্বলছে তাঁবুর বাইরে, কোনো ভয় নেই, ওরা ঘেসবে না এদিকে।

সকালে উঠে আবার ওপরে ওঠা শুরু। উঠে, উঠে—মাইলের পর মাইল বন্য বাঁশের অরণ্য, তার তলায় বুনো আদা। ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদিকের বাঁশ-বনের তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড হস্তীযুথ কচি বাঁশের কোঁড় মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল।

পাঁচ হাজার ফুট ওপরে কত কি বন্য পুষ্পের মেলা—

টুকটুকে লাল ইরিথ্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মত কিন্তু রংটা অত গাঢ় বেগুনী নয়। শাদা ভেরোনিকা ঘন শ্লগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করেছে। বহু কফির ফুল, রঙীন বেগোনিয়া। মেঘের রাজ্যে ফুলের বন, মাঝে মাঝে সাদা বেলুনের মত মেঘপুঞ্জ গাছপালার মগ্ডালে এসে আটকাচ্ছে—কখনও বা আরও নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে সাত হাজার ফুটের ওপর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও ছাঁদিন লেগেছে। আর অসহ্য কষ্ট, কোমর পিঠ ভেঙে পড়ছে। এখানে বনানীর মূর্তি বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে—সে শেওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটীতে এসে ঠেকবার মত হয়েচে—বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, তার ওপর কোথাও সূর্যের আলো নেই, সব সময়ই যেন গোধূলি। আর সবটা ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরণের নিস্তরঙ্গতা—বাতাস বইচে তারও শব্দ নেই, পাখীর কুজন নেই সে বনে—মানুষের গলার শুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই। যেন কোন্ অন্ধকার নরকে দীর্ঘশ্মশ্রু প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়েছে ওরা।

সেদিন অপরাহ্নে যখন আলভারেজ তাঁবু ফেলে বিজ্রাম করবার হুকুম দিলে—তখন তাঁবুর বাইরে বসে এক পাত্র কফি খেতে খেতে শঙ্করের মনে হোল, এ যেন সৃষ্টির আদিম যুগের অরণ্যাণী, পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ যখন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করেনি, যে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরাট-কায় সরীসৃপের দল জগৎজোড়া বনজঙ্গলের নিবিড় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতো—সৃষ্টিব সেই অতীত প্রভাতে সে যেন কোন্ যাছ্‌মস্তের বলে ফিবে গিয়েচে।

সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হোল। তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেচে—সেই আলোর মণ্ডলীর বাইরে আব কিছু দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্য্য নিস্তব্ধতা শঙ্করকে বিস্মিত কবেচে। বনানীর সেই বিচিত্র নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আলভারেজ চিস্তিত মুখে ম্যাপ দেখছিল। বল্লে—শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবচি। আট হাজার ফুট উঠ্‌লাম, কিন্তু এখনও পর্বতের সেই খাঁজটা পেলাম না। যেটা দিয়ে আমরা বেজ্‌ পার হয়ে ওপারে যাবো। আর কত ওপরে উঠ্‌বো? যদি ধরো এই অংশে স্কাড্‌ল্‌টা নাই থাকে?

শঙ্করের মনেও এ খট্‌কা যে না জেগেচে তা নয়। সে আজই ওঠ্‌বার সময় মাঝে মাঝে ফিল্ড্‌ গ্যাস্‌ দিয়ে ওপরের দিকে দেখবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু ঘন মেঘে বা কুয়াশায় ওপরের দিকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ

হয়েছে। সত্যিই তো তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যদি না পাওয়া যায়? আবার নীচে নামতে হবে, আবার অগ্নি জায়গা বেয়ে উঠতে হবে। দফা মারা।

সে বললে—ম্যাপে কি বলে?

আলভারেজের মুখ দেখে মনে হোল ম্যাপের ওপর সে আস্তা হারিয়েচে। বললে—এ ম্যাপ অত খুঁটিনাটি ভাবে তৈরী নয়। এ পর্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরী হবে? এই যে দেখেচো—এখানা সার ফিলিপো ডি ফিলিপির তৈরী ম্যাপ, যিনি পর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার ফার্ডিনাণ্ডো পো শৃঙ্গ আরোহণ করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে বিখ্যাত পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অফ আক্কেসির অভিযানেও যিনি ছিলেন। কিন্তু বিখ্যাতরম্ভেন্ড তিনি ওঠেন নি, এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কনটুর আঁকা আছে, তা খুব নিখুঁত বলে মনে তো হয় না। ঠিক বুঝি নে।

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল—ও কি?

তীব্র বাইরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, এবং পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল—যেন থাইসিসের রোগী খুব কষ্টে কাতর ভাবে কাশ্চে। একবার... দুবার... তারপরেই শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু সেটা মানুষের গলার শব্দ নয়, শুনবা মাত্রেরই শঙ্করের সে কথা মনে হোল।

রাইফেল নিয়ে সে ব্যস্তভাবে তীব্র বার হতে যাচ্ছে, আলভারেজ তাড়াতাড়ি উঠে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলে।

শঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কেন, কিসের শব্দ ওটা ?

কথা বলে আলভারেজের দিকে চাইতেই ও বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আলভারেজের মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে, শব্দটা শুনেই কি !

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর অগ্নিকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ জীব যেন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে বেশ মনে হোল ।

ছ'জনেই খানিকটা চুপচাপ, তারপরে আলভারেজ বল্লে—  
আগুনে কাঠ ফেলে দাও । বন্দুক ছটো ভরা আছে কি না দেখ । ওর মুখের ভাব দেখে শঙ্কর ওকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলে না ।

রাত্রি কেটে গেল ।

পরদিন সকালে শঙ্করেরই আগে ঘুম ভাঙল । তাঁবুর বাইরে এসে কফি করবার আগুন জ্বালতে সে তাঁবু থেকে কিছুদূরে কাঠ ভাঙতে গেল । হঠাৎ তার নজর পড়ল ভিজ়ে মাটির ওপর একটা পায়ের দাগ—লম্বায় দাগটা ১১ ইঞ্চির কম নয়, কিন্তু তিনটে মাত্র পায়ের আঙুল । তিন আঙুলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট । পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল—আরও অনেক গুলো সেই পায়ের দাগ আছে, সবগুলোতেই সেই তিন আঙুল ।

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগাণ্ডার ট্রেশন ঘরে আলভারেজের মুখে শোনা জিম্ কার্টারের মৃত্যুকাহিনী । গুহার মুখে বালির

ওপর সেই অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ারের তিন আঙুলওয়ালা পায়ের দাগ। কাফির গ্রামের সর্দারের মুখে শোনা গল্প।

আলভারেজের কাল রাত্রের বিবর্ণ মুখও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর একদিনও আলভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়ে ছিল, যেদিন পর্বতের পাদমূলে ওরা প্রথম এসে তাঁবু পাতে।

বুনিপ্! কাফির সর্দারের গল্পের সেই বুনিপ্! রিখটারস্-ভেন্ড পর্বত ও অরণ্যের বিভীষিকা, যার ভয়ে শুধু অসভ্য মানুষ কেন, অণু কোনো বণু জন্তু পর্য্যন্ত এই আট হাজার ফুটের ওপরকার বনে আসে না। কাল রাত্রে কোনো জানোয়াবের শব্দ পাওয়া যায় নি কেন, এখন তা শঙ্করের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলভারেজ পর্য্যন্ত ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর গলার শব্দ শুনে। বোধ হয় ও শব্দের সঙ্গে আলভারেজের পূর্বে পরিচয় ঘটেছে।

আলভারেজের ঘুম ভাঙতে সেদিন একটু দেরী হোল। গরম কফি এবং কিছু খাওয়া গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আশার সেই নির্ভীক ও দুর্দ্ধর আলভারেজ, যে মানুষকেও ভয় করে না, শয়তানকেও না। শঙ্কর ইচ্ছে করেই আলভারেজকে ঐ অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না—কি জানি যদি আলভারেজ বলে বসে—এখনও পাহাড়ের স্ট্রাড্‌ল পাওয়া গেল না, তবে নেমে যাওয়া যাক্।

সকালে সেদিন খুব মেঘ করে ঝন্ ঝন্ করে বৃষ্টি নামলো। পর্বতের ঢালু বেয়ে যেন হাজার ঝরণার ধারায় বৃষ্টির জল

গড়িয়ে নীচে নামচে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন খাঁধা লাগিয়ে দেয়, এতটা উঠেচে ওরা কিন্তু, প্রতি হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে সেগুলিকে সমতলভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হচ্ছে—কাজেই প্রথমটা মনে হয় যেন কতটুকুই বা উঠেচি, এটুকু তো।

বৃষ্টি সেদিন থামলো না—বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবে আলভারেজ উঠবার হুকুম দিলে। শঙ্কর এটা আশা করে নি। এখানে শঙ্কর কস্মী শ্বেতাঙ্গ-চরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া? একটা দিনে কি এমন হবে? বৃষ্টি-মাথায় পথ চলে লাভ?

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে ঘন অরণ্যানী ভেদ করে সেদিন ওরা সারাদিন উঠল। উঠে, উঠে, উঠেই—শঙ্কর আর পারে না। কাপড়-চোপড় জিনিস-পত্র, তাঁবু সব ভিজে একশা, এক-খানা রুমাল পর্য্যন্ত শুকনো নেই কোথাও—শঙ্করের কেমন একটা অবমাদ এসেচে দেহে ও মনে—সন্ধ্যার দিকে যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার হয়ে ভীমদর্শন ও গস্তীর হয়ে উঠল, ওর তখন মনে হোল—এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনের মধ্যে দিয়ে, বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায়, কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়? আলভারেজ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকাব নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া



ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখীদের কাকলী—সে সব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।

কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেষ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে—সে আর কোথাও ফিরতে চায় না, হীরা চায় না, অর্থ চায় না—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু উর্দ্ধে এক কোমুদী-শুভ্র দেবলোকের এখন সে অধিবাসী, তার চারিধারে যে সৌন্দর্য্য, কোনো মানুষের চোখ এর আগে তা কখনো দেখে নি। সে গহন নিস্তর্রতা, এর আগে তা কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল রিক্টারস্‌ভেল্ড পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত—পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে।

সেই রাত্রে ঘুম থেকে ও ধড়মড়িয়ে উঠল আলভারেজের ডাকে। আলভারেজ ডাক্‌চে—শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দুক বাগাও—  
—কি-কি—

তারপর ও কাণ পেতে শুনলে—তাঁবুর চারিপাশে কে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে তাঁবুর মধ্যে থেকে। চাঁদ ঢলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে

অন্ধকারই বেশী, জ্যোৎস্নাটুকু গাছের মগডালে উঠে গিয়েচে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর দরজার মুখে আগুন তখনও একটু একটু জ্বলচে—কিন্তু তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর জ্যোতিও ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না।

হুড়মুড় করে একটা শব্দ হোল—গাছপালা ভেঙে একটা ভারী জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালালো যেন। যেন তাঁবুর সকলে সজাগ হয়ে উঠেচে, এখন আর অতর্কিত শিকারের সুবিধে হবে না, বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেচে।

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বুদ্ধি আছে, বিচারের ক্ষমতা আছে, মস্তিষ্ক আছে।

আলভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জ্বলে বাইরে গেল। শঙ্করও গেল ওব পেছনে পেছনে। টর্চেব আলোয় দেখা গেল, তাঁবুর উত্তর-পূর্ব কোণেব জঙ্গলের চাবা গাছপালার ওপর দিয়ে যেন একটা ভাবী ষ্টীম রোলার চলে গিয়েচে। আলভারেজ সেইদিকে বন্দুকের নল উচিয়ে বার দুই দেওড় করলো।

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

তাঁবুতে ফিরবার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনেব কুণ্ডের অতি নিকটেই একটা পায়ের দাগ ছ'জনেরই চোখে পড়ল। তিনটা মাত্র আঙ্গুলের দাগ ভিজ়ে মাটির ওপর সুস্পষ্ট।

এতে প্রমাণ হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় না।

শঙ্করের মনে হোল, যদি ওদের ঘুম না ভাঙতো, তবে সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটী তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একটুও দ্বিধা করতো না—এবং তারপরে কি ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ নেই। আল্ভারেজ বললে—শঙ্কর, তুমি তোমার ঘুম শেষ করো, আমি জেগে আছি।

শঙ্কর বললে—না, তুমি ঘুমোও আল্ভারেজ।

আল্ভারেজ ক্ষীণ হাসি হেসে বললে—পাগল, তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না, শঙ্কর। ঘুমিয়ে পড়ো, ঐ দেখ দূরে বিহ্যৎ চমকাচ্ছে, আবার ঝড় বৃষ্টি আসবে, বাত শেষ হয়ে আসচে, ঘুমোও। আমি বরং একটু কফি খাই।

রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে এল মুষল ধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিহ্যৎ, তেমনি মেঘগর্জ্জন। সে বৃষ্টি চলল সমানে সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শঙ্করের মনে হোল, পৃথিবীতে আজ প্রলয়ের বর্ষণ হয়েছে শুরু, প্রলয়ের দেবতা সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেচেন বুঝি। বৃষ্টির বহর দেখে আল্ভারেজ পর্য্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবাব নাম মুখে আনতে ভুলে গেল।

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকাল পাঁচটা। বোধ হয়, বৃষ্টি না থামলেই ভাল ছিল, কারণ অমনি আল্ভারেজ চলা শুরু করবার হুকুম দিলে। বাঙ্গালী ছেলের স্বভাবতঃই মনে হয়—এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছে? কিন্তু আল্ভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না,

অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূমির মধ্যে দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় ছুঁজনে উঠে, উঠে— এমন সময় আলভারেজ পেছন থেকে বলে উঠল—শঙ্কর দাঁড়াও, ঐ দেখ—

আলভারেজ ফিস্‌ড গ্লাস্ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে বাঁ পাতের পর্বত-শিখরের দিকে চেয়ে দেখে। শঙ্কর ওর হাত থেকে গ্লাস্টি নিয়ে সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। হাঁ, সমতল খাঁজটা পাওয়া গিয়েছে! বেশী দূরেও নয়, মাইল দুইয়ের মধ্যে, বাদিক ঘেঁসে।

আলভারেজ হাসিমুখে বললে—দেখেচ স্যাডলটা? থামবার দরকার নেই, চল আজ রাত্রেই স্যাডলের ওপর পৌঁছে তাঁবু ফেলবো। শঙ্কর আর সত্যিই পারছে না। এ দুর্দ্ধ পটু'গিজ্‌টার সঙ্গে হীরার সন্ধানে এসে সে কি ঝক্‌মারী না করেছে! শঙ্কর জানে অভিযানের নিয়মানুযায়ী দলপতির হুকুমের ওপর কোনো কথা বলতে নেই। এখানে আলভারেজই দলপতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে না। কোথাও আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় অভিযানে সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। সেও মানবে।

অবিশ্রান্ত হাঁটবার পরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে স্যাডলে যখন উঠল—শঙ্করের তখন আর এক পাও চলবার শক্তি নেই।

স্যাডলটার বিস্তৃতি তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা

ছশো ফুট খাড়া উঠচে, কখনো বা চার পাঁচশো ফুট নেমে গেল একমাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ ছুরারোহ—যতটুকু সমতল, ততটুকু শুধুই বড় বড় বনস্পতির জঙ্গল, ইরিথ্রিনা, পেনসিয়ানা, বিঠাগাছ, বাঁশ, বন্য আদা। বিচিত্র বর্ণের অর্কিডের ফুল ডালে ডালে। বেবুন ও কলোবাস বানর সর্বত্র।

আরও ছদিন ধরে ক্রমাগত নামতে নামতে ওরা রিখ্টারস্‌ভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে পদার্পণ করলো। শঙ্করের মনে হোল, এদিকে জঙ্গল যেন আবও বেশী দুর্ভেদ্য ও বিচিত্র। আটলান্টিক মহাসাগরের দিক থেকে সমুদ্রবাস্প উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুণ পর্বতে, বাকীটা আটকায় বিশাল রিখ্টারস্‌ভেল্ডের দক্ষিণ সান্নিতে—সুতবাং বৃষ্টি এখানে হয় অজস্র, গাছপালাব তেজও তেমনি।

দিন পনেবো ধবে সে বিরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার সর্বত্র ছ'জনে মিলে খুঁজেও আলভারেজ বর্ণিত পাহাড়ী নদীর কোনো ঠিকানা বাব কবতে পাবলে না। ছোটখাটো ঝরণা ছ'একটা উপত্যকার উপর দিয়ে বইচে বটে—কিন্তু আলভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আব বলে—এ সব নয়।

শঙ্কব বলে—তোমাব ম্যাপ দেখো না ভালো করে? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আলভাবেজ বলে—ম্যাপ কি হবে? আমার মনে গভীর ভাবে ঝাকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি—

সে একবার দেখতে পেলেই তখুনি চিনে নেবো। এ সে জায়গাই নয়, এ উপত্যকা সে উপত্যকাই নয়।

নিরুপায়। খোঁজো তবে।

একমাস কেটে গেল। পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ মাসের প্রথমে। সে কী ভয়ানক বর্ষা! শঙ্কর তাব কিছু নমুনা পেয়ে এসেচে রিখ্টারস্‌ভেন্ডে, পার হবার সময়ে। উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে নামা বড় বড় পার্বত্য বরণার জলধারায়। তাঁবু ফেলবার স্থান নেই। একরাত্রে হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে ওদের তাঁবুর সামনের একটা নিবীহ ক্ষীণকায়া বরণা ধারা ভীমমূর্ত্তি ধারণ করে ওদের তাঁবুশুদ্ধ ওদের শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবার যোগাড় কবেছিল—আল-ভারেজের সজাগ ঘুমের জন্তে সে যাত্রা বিপদ কেটে গেল।

কিন্তু দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শঙ্কর একদিন ঘোর বিপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত ধরণের।

সেদিন আলভারেজ তাঁবুতে তার নিজের রাইফেল পরিক্ষার করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল। শঙ্কর রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

আলভারেজ বলে দিয়েচে তাকে এ বনে খুব সতর্ক হয়ে সাবধানে চলাফেরা করতে—আর বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কাট্রিজ ভরা থাকে। আর একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিয়েচে, সেটা এই — বনের মধ্যে বেড়াবার সময়

হাতের কজ্জিতে কম্পাস্ সর্বদা বেঁধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধারে গাছপালায় কোনো চিহ্ন বেখে যাবে, যাতে ফিরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো। নতুবা বিপদ অবশ্যস্বাবী।

একদিন শঙ্কর স্প্রিংবক্ হরিণের সন্ধানে গভীর বনে চলে গিয়েচে। সকালে বেরিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে একজায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একটু বিশ্রামের জন্তে বসল।

সেখানটাতে চারিধারেই বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির মেলা, আক সব গাছেই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে একপ্রকারেব বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমনি নিবিড় ভাবে আটপেঁপে গাছগুলো জড়িয়েচে যে গুঁড়ির আসল রং দেখা যায় না। কাছেই একটা ছোট্ট জলার ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে মাঝি পোসা লিলি ফুটে রয়েছে।

খানিকটা সেখানে বসবাব পরে শঙ্করের মনে হোল তার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কি ধরনের অস্বস্তি তা সে কিছু বুঝতে পারলে না—অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে হোল না—সে ক্লান্তও বটে, আর জায়গাটাও বেশ আরামেরও বটে।

কিন্তু এ তার কি হোল? তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ কোথা থেকে এল? ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল নাকি?

অবসাদটা কাটাবার জন্তে সে পকেট হাতড়ে একটা চুরুট

বার করে খরালে। কিসের একটা মিষ্টি মিষ্টি সুগন্ধ বাতাসে—শঙ্করের বেশ লাগচে গন্ধটা। একটু পরে দেশলাইটা মাটি থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হোল, হাতটা যেন তার নিজের নেই—যেন আর কারো হাত, তার মনের ইচ্ছায় সে হাত নড়ে না।

ক্রমে তার সর্বশরীর যেন বেশ একটা আরাম দায়ক অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল। কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, আলেয়ার পিছু পিছু বৃথা ছুটে, এই রকম বনের ঘন ছায়ায় নিভৃত লতাবিতানে অলস স্বপ্নে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে সুখ আর কি আছে?

একবার তার মনে হোল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া যাক্, নতুবা তার কোনো একটা বিপদ ঘটবে যেন। একবার সে উঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তার দেহমনব্যাপী অসবাদের জয় হোল। অবসাদ নয়, যেন একটা মৃদুমধুর নেশার আনন্দ। সমস্ত জগৎ তার কাছে তুচ্ছ। সে নেশাটাই তার সারাদেহ অবশ করে আনচে ক্রমশঃ।

শঙ্কর গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে ভাল করেই শুয়ে পড়ল। বড় বড় কটন উড্ গাছেব ডালে শাখায় আলোছায়ার রেখা বড় অস্পষ্ট, কাছেই কোথাও বগ্ন পেচকের স্বনি অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, ক্রমে যেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসচে। তারপরে কি হোল শঙ্কর আর কিছু জানে না।

আলভারেজ যখন বহু অল্পসঙ্কানের পর ওর অচৈতন্য দেহটা



কটন উড্ জঙ্গলের ছায়ায় আবিষ্কার করলে, তখন বেলা বেশী নেই। প্রথমটা আলভারেজ মনে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই সর্পাঘাত —কিন্তু দেহটা পরীক্ষা করে সর্পাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ মাথার ওপরকার ডালপালা ও চারিধারে গাছপালার দিকে নজর পড়তেই অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী আলভারেজ

ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে।

সে খা নটাতে সর্বত্র অতি  
মারাত্মক বিষ-লতার বন (Poison  
Ivy) যার রসে আফ্রিকার



অসভ্য মানুষেরা তীরের ফলা ভুবিয়ে নেয়। যার বাতাস এমনি বেশ সুগন্ধ বহন করে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হতে পারে, মৃত্যু ঘটনাও আশ্চর্য্য নয়।

তীব্রতে এসে শঙ্কর ছ'তিন দিন শয্যাগত হয়ে রৈল। সর্ব্বশরীর ফুলে ঢোল। মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে আর সর্ব্বদাই

তৃষ্ণায় গলা কাঠ। আলভারেজ বলে—যদি তোমাকে সারা রাত ওখানে থাকতে হোত—তা হোলে সকালবেলা তোমাকে বাঁচানো কঠিন হোত।

একদিন একটা ঝরণার জলধারার বালুময় তীরে শঙ্কর হলদে রঙের কি দেখতে পেল। আলভারেজ পাকা প্রস্পেক্টর, সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে—কিন্তু তাতে সে বিশেষ উৎসাহিত হোল না। সোনার পরিমাণ এত কম যে মজুরি পোষাবে না—এক-টন বালি ধুয়ে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া হয়তো যেতে পারে।

শঙ্কর বললে—বসে থেকে লাভ কি, তবু যা সোনা পাওয়া যায়, তিন আউন্স সোনার দামও তো কম নয়।

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জিনিষ বলে মনে করেছে, অভিজ্ঞ প্রস্পেক্টর আলভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। তাছাড়া শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্য্যন্ত ও কাজ শঙ্করকে ছেড়ে দিতে হোল।

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে বেড়ালে। আজ এখানে ছ'দিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে আর এক জায়গায় উঠে যায়, সেখানে কিছুদিন তন্ন তন্ন করে চারিধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে যায়। সেদিন অরণ্যের একটা স্থানে ওরা নতুন পৌঁছে তাঁবু পেতেছে। শঙ্কর বন্দুক নিয়ে ছ'একটা পাখী শিকার করে সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে

এসে দেখলে, আলভারেজ বসে চুরুট টানচে, তার মুখ দেখে মনে হোল সে উদ্ভিগ্ন ও চিন্তিত ।

শঙ্কর বল্লে—আমি বলি আলভারেজ, তুমিই যখন বার করতে পারলে না, তখন চলো ফিরি ।

আলভারেজ বল্লে—নদীটা তো উড়ে যায় নি, এই বন পর্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে ।

—তবে আমরা বার করতে পারচি নে কেন ?

—আমাদের খোঁজা ঠিকমত হচ্ছে না ।

—বল কি আলভারেজ, ছ'মাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছি, আবার কাকে খোঁজা বলে ?

আলভারেজ গম্ভীর মুখে বল্লে—কিন্তু মুশ্কিল হয়েচে কোথায় জানো, শঙ্কর ? তোমাকে এখনও কথাটা বলি নি, শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় পাবে ! আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, এসো আমার সঙ্গে ।

শঙ্কর অধির আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে চললো । ব্যাপারটা কি ?

আলভারেজ একটু দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বল্লে—শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে তাঁবু পেতেছি, ঠিক তো ?

শঙ্কর অবাক হয়ে বল্লে—এ কথার মানে কি ? আজই তো এখানে এসেচি না আবার কবে এসেচি ?

—আচ্ছা, এই গাছের গুঁড়ির কাছে সরে এসে দেখো তো ?

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, গুঁড়ির নরম ছাল ছুরি দিয়ে খুদে কে 'D. A.' লিখে রেখেচে—কিন্তু লেখাটা টাটকা নয়, অন্ততঃ মাসখানেকের পুরানো।

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে না। আলভারেজের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আলভারেজ বললে—বুঝতে পারলে না? এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার নামের অঙ্কর দুটি খুদে রাখি। আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান। এর মানে এখন বুঝেচ? আমরা চক্রাকারে বনের মধ্যে ঘুরছি। এ সব জায়গায় যখন এ রকম হয়, তখন তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শক্ত।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা। বললে—তুমি বলতে চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসেছিলাম?

—ঠিক তাই। বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। একে বলে death circle, আমার মনে মাসখানেক আগে প্রথমে সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা death circle এ পড়েছি। সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্মেই গাছের ছালে ঐ অঙ্কর খুদে রাখি। আজ বনের মধ্যে বেড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ল।

শঙ্কর বললে—আমাদের কম্পাসের কি হোল? কম্পাস থাকতে দিকভুল হচ্ছে কি ভাবে রোজ রোজ?

আলভারেজ বললে—আমার মনে হয় কম্পাস খারাপ হয়ে গিয়েচে। রিখটারস্কেল পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক

ঝড় ও বিদ্যুৎ হয়, তাতেই কি ভাবে ওর চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তা হোলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো ?

—আমার তাই ধারণা।

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, কম্পাস অকেজো, তার ওপর ওরা পড়েছে এক ভীষণ দুর্গম গহনারণ্যেব মাঝে বিষম মরণ ঘূর্ণীতে। জনমানুষ নেই, খাবার নেই, জলও নেই বলেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল যখন পানের উপযুক্ত নয়। থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ, অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম্ কার্টার এই অভিশপ্ত অবগ্যানীব মধ্যে রক্তের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কাবো মঙ্গল হবে বলে মনে হয় না।

আল্‌ভারেজ কিন্তু দমে যাবার পাত্রই নয়। সে দিনেব পর দিন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূল-কিনারা পায় না। শঙ্কর, আগে যাও বা ভিল, ঘূর্ণীপাকে তাবা ঘুরচে শোনা অবধি, শঙ্করের দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে।

দিন তিনেক পরে ওরা একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হোল, সেখানে রিখটারস্‌ভেল্ডের একটা শাখা আসল পর্বত-মালার সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর দিকে লম্বালম্বি হয়ে আছে। খুব কম হোলেও সেটা ৪০০০ হাজার ফুট উঁচু। আরও পশ্চিম দিকে একটা খুব উঁচু পর্বতচূড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি

খেলচে। দুই পাহাড়ের মধ্যকার উপত্যকা তিন মাইল বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা।

বনে গাছপালার যেন তিনটে চারটে থাকে। সকলের ওপরের থাকে শুধুই পরগাছা ও শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় বনস্পতির ভিড়, নীচের থাকে ঝোপ ঝাপ, ছোট ছোট গাছ। সূর্যের আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে।

আলভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু ফেলতে বসে। সন্ধ্যার সময় ওরা কফি খেতে খেতে পরামর্শ করতে বসল যে, এখন কি করা যাবে। খাবার একদম ফুরিয়েচে, চিনি অনেকদিন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আর দু'এক দিন পরে কফিও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনও আছে—কিন্তু আর কিছুই নেই। ময়দা এই জন্তে আছে, যে ওরা ও জিনিষটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান ভরসা বন্য জন্তুর মাংস কিন্তু সঙ্গে যখন ওদের গুলি বারুদের কারখানা নেই, তখন শিকাবের ভরসাই বা চিরকাল করা যায় কি করে ?

কথা বলতে বলতে শঙ্কর দূরের যে পাহাড়ের চূড়াটা মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে, সেদিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতিল। এই সময়ে অল্লক্ষণের জন্তে মেঘ সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। চূড়াটার অদ্ভুত চেহারা, যেন একটা কুলপী বরফের আগার দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেচে।

আলভারেজ বলে—এখান থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে

বুলাওয়েও কি সল্‌সবেরী চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের মধ্যে । মধ্যে শ দুই মাইল মরুভূমি । পশ্চিম দিকে উপকূল তিনশো মাইলের মধ্যে বটে, কিন্তু পটুগিজ পশ্চিম আফ্রিকা অতি ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সেদিকের কথা বাদ দাও । এখন আমাদের উপায় হচ্ছে, হয় তুমি নয় আমি সল্‌সবেরী কি বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কিনে আনি । কম্পাসও চাই ।

আলভারেজের মুখের এই কথাটা বড় গুভিক্ষণে শঙ্কর শুনেছিল । দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা মানুষে কি সব সময় বোঝে ? দৈবক্রমে ‘বুলাওয়েও’ ও ‘সল্‌সবেরী’ দুটো সহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিক্ ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শঙ্করের কাণে গেল । এর পরে সে কত-বার মনে মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, এই নাম দুটো বলবার জন্যে ।

কথাবার্তা সেদিন বেশী অগ্রসর হোল না । ছু’জনেই পরিশ্রান্ত ছিল, সকালে সকালে শয্যা আশ্রয় করলে ।



## আট

মাঝ রাত্রে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল। কি একটা শব্দ হচ্ছে ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটছে বনে। আলভারেজও বিছানায় উঠে বসে'স। ছু'জনেই কাণ-খাড়া কবে গুনলে—বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কি হচ্ছে বাইরে?

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে। বল্লে—এ সব অজানা জঙ্গলে রাত্রিবেলা ও রকম



তাড়াতাড়ি তাঁবু বাইবে যেও না। তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?

তাঁবুর বাইরে রাত্রি ঘুটঘুটে অন্ধকার! ছু'জনেই টর্চ ফেলে দেখলে—

বন্য-জন্তুর দল গাছ-পালা ভেঙ্গে উদ্ধ্বাসে উদ্ভয়ের মত দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পশ্চিমের সেই ভীষণ



জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, পূর্বদিকে পাহাড়টার দিকে চলেচে! হায়েনা, বেবুন, বুনো মহিষ। ছোটো চিতাবাঘ তো ওদের গা ঘেঁসে ছুটে পালালো। আরও আসচে...দলে দলে আসচে... খাড়ী ও মাদী কলোবাস্ বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা নিয়ে ছুটেচে...সবাই যেন কোনো আকস্মিক বিপদের মুখ থেকে প্রাণেব ভয়ে ছুটেচে!...আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে কোথায় একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে—চাপা, গম্ভীর, মেঘগর্জনের মত শব্দটা কিংবা দূরে কোথাও হাজারটা জয়টাক যেন এক সঙ্গে বাজচে!

ব্যাপাব কি! ছ'জনে ছ'জনের মুখের দিকে চাইলে। ছ'জনেই অবাচ্। আলভারেজ বলে—শঙ্কর, আগুনটা ভাল কবে জ্বালো—নয়তো বহুজন্তুর দল আমাদের তাঁবুশুদ্ধ ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে।

জন্তুদেব সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথাব ওপরেও পাখীর দল বাসা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা স্প্রিংবক্ হরিণেব দল ওব দশগজের মধ্যে এসে পড়ল।

কিন্তু ওবা- ছ'জনে তখন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েচে ব্যাপাব দেখে, যে এত কাছে পেয়েও গুলি কবতে ভুলে গেল। এমন ধরণের দৃশ্য ওবা জীবনে কখনো দেখেনি!

শঙ্কর আলভারেজকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তারপরেই—প্রলয় ঘটল। অন্ততঃ শঙ্করের তো তাই বলেই মনে হলো। সমস্ত পৃথিবীটা তুলে এমন কেঁপে উঠল যে, ওবা ছ'জনেই টলে পড়ে গেল মাটীতে, সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ্

যেন নিকটেই কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল—  
আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটলো।

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে করতে বললে  
—ভূমিকম্প!

কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখে বিস্মিত হোল, রাত্রির অমন  
ঘূটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দূর হয়ে, পঞ্চাশহাজার বাতির এমন  
বিজ্জ্বলি আলো জ্বলে উঠল কোথা থেকে?

তারপর তাদের নজর পড়ল, দূরের সেই পাহাড়ের চূড়াটার  
দিকে। সেখানে যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু হয়েছে।  
রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন-  
রাঙা মেঘ ফুঁসিয়ে উঠেছে পাহাড়ের চূড়া থেকে ছ'হাজার আড়াই  
হাজার ফুট পর্যন্ত উচুতে—সঙ্গে সঙ্গে কি বিস্মী গন্ধকের উৎকট  
নিঃস্বাস-রোধকারী গন্ধ বাতাসে!

আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠল—  
আগ্নেয়গিরি! সান্টা আনা গ্রাৎসিয়া ডা কর্ডোভা!

কি অদ্ভুত ধরণের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! কেউ চোখ ফিরিয়ে  
নিতে পারলে না ওরা খানিকক্ষণ। লক্ষটা তুবড়ি এক সঙ্গে  
জ্বলছে, লক্ষটা রঙ মশালে একসঙ্গে আগুন দিয়েছে, শঙ্করের  
মনে হোলো। রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে মাঝে নীচু হয়ে যায়,  
হঠাৎ যেমন আগুনে ধুনো পড়লে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, অমনি  
দপ্ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে। আর সেই সঙ্গে হাজারটা  
বোমাফাটার আওয়াজ।

এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপচে, যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—কেবল টলে টলে পড়তে হয়। শঙ্কর তো টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো—ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুর ছানার মত জীব তার বিছানায় এক সঙ্গে গুটিশুটি হয়ে ভয়ে কাঁপচে। শঙ্করের টর্চের আলোয় সেটা খতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দুটো মণির মত জ্বলতে লাগলো। আলভারেজ তাঁবুতে ঢুকে দেখে বল্লে—নেকড়ে বাঘের ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েচে যখন প্রাণের ভয়ে।

ওরা কেউ এর আগে প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখেনি, তা থেকে বিপদ আসতে পারে ওদের জানা নেই—কিন্তু আলভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ কি প্রচণ্ড ভারী জিনিসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সেব ওজনের জ্বলন্ত কয়লার মত রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের ওপর এসে পড়েচে — সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটাও জ্বলে উঠেচে — তখন আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বল্লে—পালাও, পালাও ; শঙ্কর—তাঁবু ওঠাও—শীগগির—

ওরা তাবু ওঠাতে ওঠাতে আরও দু'পাঁচখানা আগুন-রাঙা জ্বলন্ত ভারী পাথর এদিকে ওদিকে সশব্দে পড়লো। নিঃশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমনি ঘন গন্ধকের ধূম বাতাসে ছড়িয়েচে।

দৌড়...দৌড়...দৌড়...দু'ঘণ্টা ধরে ওরা জিনিসপত্র কতক

টোনে হিঁচড়ে, কতক বয়ে নিয়ে পূবদিকের সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে। আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুরু করলে। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর রাত্রির অন্ধকার ঠেলে। ভোর যখন হোল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে পাহাড়ের ঢালুতে বড় গাছের তলায়, দু'জনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লো।

সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সে ভীষণ সৌন্দর্য্য অনেকখানি কমে গেল, কিন্তু শব্দ ও পাথর-পড়া যেন বাড়লো। এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব মিঠি ধূসরবর্ণের ছাঁঠ আকাশ থেকে পড়চে...গাছপালা লতাপাতার ওপর দেখতে দেখতে পাংলা একপুরু ছাই জমে গেল।

সাবাদিন সমানভাবে অগ্নিলীলা চললো—আবার রাত্রি এল। নিম্নের উপত্যকা ভূমির অতবড় হেমলক্ গাঁছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তুতবর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল। রাত্রিতে আবার সেই ভীষণ সৌন্দর্য্য, কতদূর পর্য্যন্ত বন ও আকাশ, কতদূরের দিগন্ত লাল হয়ে উঠেচে পর্ব্বতের অগ্নিকটাহের আগুনে—তখন পাথর পড়াটা একটু কেবল কমেচে। কিন্তু সেই রাঙা আগুন ভরা বাষ্পের মেঘ তখনও সেই রকমই দীপ্ত হয়ে উঠেচে।

বাত ছপূরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরনের শব্দে ওদের ভল্লা ছুটে গেল—ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জ্বলন্ত পাহাড়ের

চূড়ার মুণ্ডটা উড়ে গিয়েচে—নীচের উপত্যকাতে ছাই, আগুন ও জ্বলন্ত পাথর ছড়িয়ে পড়ে অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা দিলে। আল্‌ভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হোল। ওদের তাঁবুর কাপড়ে আগুন ধরে গেল। পেছনের একটা উঁচু গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে।

শঙ্কর ভাবছিল—এই জনহীন আরণ্য অঞ্চলে এত বড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও পেতো না, যদি তাঁরা না থাকতো। সভ্য জগৎ জানেও না, আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব। কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে জ্বলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে। কুল্লী বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েচে।

আল্‌ভারেজ ম্যাপ দেখে বললে—এটা আগ্নেয়গিরি বলে ম্যাপে দেওয়া নেই। সম্ভবতঃ বহু বৎসর পরে এই এর প্রথম অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা খুব অর্থপূর্ণ।

শঙ্কর বললে—কি নাম ?

আলভারেজ বললে—এর নাম লেখা আছে ‘ওল্ডোনিও লেঙ্গাই’—প্রাচীন জুলু ভাষায় এর মানে ‘অগ্নিদেবের শয্যা’। নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে

এ পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। বোধহয় তারপর ছ'একশো বছর কিংবা তার বেশীকাল এটা চুপচাপ ছিল।

ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনি আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্রদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়েছেন, এজ্ঞে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়, আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হোল।



## নয়

আগ্নেয় পর্বতের অত কাছে বাস করা অলভ্যারেজ উচিত বিবেচনা করলে না। ওল্ডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধুমায়িত শিখরদেশের সান্নিধ্য পরিত্যাগ ক'রে, তারা আরও পশ্চিম ঘেঁসে চলতে লাগল। সেদিকের গহন অরণ্যে আগুনের আঁচটীও লাগেনি, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশে। ছোট বড় কত বরণাধারা ও পার্বত্য-নদী বয়ে চলেচে— তাদের মধ্যে একটাও আলভ্যারেজের পূর্ব পরিচিত নয়।

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হোল, যেখানে চারিদিকেই চূণাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড় ও প্রত্যেক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের গুহা। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য রিখটারস্কেলের সাধারণ দৃশ্য থেকে একটু অগ্ন্য রকম। এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্তু খুব বড় বড় গাছ চারিদিকে, আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা।

একটা উঁচু টিবির মত গ্রানাইটের পাহাড়ের ওপর ওবা তাঁবু ফেলে রইল। এখানে এসে পর্য্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে জায়গাটা ভাল নয়। কি একটা অস্বস্তি, মনের মধ্যে কি একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভাল ক'রে নিজেকে বুঝতে, না পারে আলভ্যারেজকে বোঝাতে।

একদিন আলভ্যারেজ বল্লে—সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা

এখনও বনের মধ্যে ঘুরছি। আজ সেই গাছটা আবার দেখেছি, সেই D. A. লেখা। অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদূর সম্ভব পশ্চিমদিক ঘেঁসেই চলেছি আজ পনেরো দিন। কি করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পারি ?

শঙ্কর বললে—তবে এখন কি উপায় ?

—উপায় আছে। আজ রাত্রে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে থেকে।

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারছিল না। তারা যদি চক্রাকারে ঘুরচে, তবে এই অল্পক্ষণে শৈলমালা ও গুহার দেশে কি করে এল ? এ অঞ্চলে তো কখনো আসে-নি বলেই মনে হয়। আলভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে সে আর কখনো তার পূর্বে আসবার চেষ্টা করে নি। পূর্বদিকে মাইল দুই এলেই এই স্থানটাতেই ওরা পৌঁছতো।

সে রাত্রে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ পড়ছিল। এই একখানাই বাংলা বই সে দেশ থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় পেলেই আবার পড়ে।

কতদূরে ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোগল-রাজপুতের বিবাদ ! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয়।



তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে আসচে বোধ হয়—কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল, এ মানুষের স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ ছুঁপায়ে থলে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাটীতে পা ঘেঁসে ঘেঁসে টেনে টেনে চললে যেন এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব। আলভারেজের উইনচেষ্টার রিপিটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেটা তাঁবুর দরজার দিকে বাগিয়ে বসলো। বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল—পরেই আবার তাঁবুর দক্ষিণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল। একটা কোনো বড় প্রাণীর যেন ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল—ঠিক যেমন পর্বত পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটেছিল, ঠিক এই রকমই। শঙ্কর একটু ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল ছুঁড়ে বসলো। একবার...ছুঁবার—

সঙ্গে সঙ্গে মিনিট দুই পরে দূরের গাছের মাথা থেকে প্রত্যুত্তরে ছুঁবার রিভলভারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আলভারেজ মনে ভেবেচে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপস্থিত, নতুবা রাত্রে খামোকা বন্দুক ছুঁড়বে কেন? বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি নেমেই আসচে।

এদিকে চারিদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজে জানোয়ারটা বোধ হয় পালিয়েচে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। শঙ্কর টর্চ জ্বলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আলভারেজকে সঙ্গেতে গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় কিছুদূরে বনের

মধ্যে হঠাৎ আবার দু'বার পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল।

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। কিছুদূরে গিয়েই দেখলে বনের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় আলভারেজ শুয়ে। টর্চের আলোয় তাকে দেখে শঙ্কর শিউরে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে—তার সর্বশরীর রক্তমাখা, মাথাটা বাকী শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে, গায়ের কোটটা ছিন্নভিন্ন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। ডাকলে—আলভারেজ ! আলভারেজ !

আলভাবেজের সাড়া নেই। তার ঠোঁট দুটো একবার যেন নড়ে উঠল, কি যেন বলতে গেল, সে শঙ্করের দিকে চেয়েই আছে, অথচ সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই ; অথবা কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাস দৃষ্টি।

শঙ্কর ওকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে এল। মুখে জল দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে, গলার নীচে কাঁধের দিকে খানিকটা জায়গার মাংস কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সারা পিঠটার সেই অবস্থা। কোন এক অসাধারণ বলশালী জন্তু তীক্ষ্ণধার নখে বা দস্তে পিঠখানা চিরে ফালা ফালা করেছে।

পাশেই নরম মাটিতে কোনো জন্তুর পায়ের দাগ—

তিনটা মাত্র আঙ্গুল সে পায়ে।

সারারাত্রি সেই ভাবেই কাটল, আলভারেজের সাড়া

নেই, সংজ্ঞা নেই। সকাল হবার সঙ্গে হঠাৎ যেন তার চেতনা ফিরে এল। শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ও অচেনার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখেনি। তারপর আবার চোখ বুঁজল। ছপুরের পর খুব সম্ভবতঃ নিজের মাতৃভাষায় কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক বর্ণও বুঝতে পারলে না। বৈকালের দিকে সে হঠাৎ শঙ্করের দিকে চাইলে। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের মনে হোল, সে ওকে চিনতে পেরেচে। এইবার ইংরাজীতে বল্লে—শঙ্কর! এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও—চল যাই—তারপর অপ্রকৃতিস্থের মত নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বল্লে—রাজার ঐশ্বর্য্য লুকোনো রয়েছে ঐ পাহাড়ের গুহার মধ্যে—তুমি দেখতে পাচ্চ না—আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই—তাঁবু ওঠাও—দেবী কোরো না।

এই আলভারেজের শেষ কথা।

\*                      \*                      \*                      \*  
\*                      \*                      \*

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর শুক্ক হয়ে বসে রইল। সন্ধ্যা হোল, একটু একটু করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল।

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আগে আগুন জ্বাললে, তারপর ছোটো রাইফেলে টোটা ভরে, তাঁবুর দোরের দিকে বন্দুকের নল বাগিয়ে, আলভারেজের মৃতদেহের পাশে একখানা সতরঞ্চির ওপর বসে রইল।

তারপর সে রাত্রে আবার নামলো তেমনি ভীষণ বর্ষা। তাঁবুর কাপড় ফুঁড়ে জল পড়ে জিনিসপত্র ভিজ়ে গেল। শঙ্কর তখন 'কিন্তু এমন হয়ে গিয়েচে যে, তার কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই ক'মাসে সে আলভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নিভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব—শঙ্করকে মুগ্ধ করেছিল। সে আলভারেজকে নিজের পিতার মত ভালবাসতো। আলভারেজও তাকে তেমনি স্নেহের চোখেও দেখতো।

কিন্তু এ সব চেয়েও শঙ্করের মনে হচ্ছে বেশী যে, আলভারেজ মারা গেল শেষকালে সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই হাতে। ঠিক জিম্ কার্টারের মতই।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মন ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সম্মুখে ভীষণ অজানা মৃত্যুদূত—ঘোর রহস্যময় তাব অস্তিত্ব। কখন সে আসবে, কখন বা যাবে, কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না। ঘুমে ঢুলে না পড়ে, শঙ্কর মনের বলে জেগে বসে রইল সারা রাত।

ওঃ, সে কি ভীষণ রাত্রি! যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এ রাত্রির কথা সে ভুলবে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে, হাজার ধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দ ও একটানা ঝড়ের শব্দে অরণ্যানীর অশ্রু সকল নৈশ শব্দকে আজ ডুবিয়ে দিয়েচে, পাহাড়ের ওপর বড় গাছ মড় মড় করে ভেঙে পড়চে। এই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে সে একা এই ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে! কালো গাছের গুঁড়িগুলো

যেন প্রেতের মত দেখাচ্ছে, অত বড় বৃষ্টিতেও জোনাকীর ঝাঁক জ্বলুচে। সম্মুখে বন্ধুর মৃতদেহ। ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই হবে মনে, নতুবা ভয়েই সে মারা যাবে। সাহস আনবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে রাইফেল ছুটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে। একটা উইনচেস্টার, অপরটা ম্যান্লিকার— ছুটোরই ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি। এমন কোনো শরীর ধারী জীব নেই, যে এই দুই শক্তিশালী অতি ভয়ানক মারণাস্ত্রকে উপেক্ষা করে আজ রাত্রে অক্ষতদেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে।

ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত সজাগ পাহারা দিল। পরদিন সকালে আলভারেজের মৃতদেহ সে একটা বড় গাছের তলায় সমাধিস্থ করলে এবং ছু'খানা গাছের ডাল ক্রুশের আকারে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর তা পুঁতে দিলে।

আলভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপটো খনি বিজ্ঞালয়েব একটা ডিপ্লোমা ছিল ওর নামে। তাদের শেষ পরীক্ষায় আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওর কথাবার্তায় অনেক সময়ই শঙ্করের সন্দেহ হোত যে, সে নিতান্ত মূর্খ, ভাগ্যান্বেষী, ভবঘুরে নয়।

লোকালয় থেকে বহুদূরে এই জনহীন, গহন অরণ্যে ক্লান্ত আলভারেজের রত্নানুসন্ধান শেষ হোল। তার মত লোকেরা রত্নের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই

তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারতো না।

দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের



বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়েনা সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে, সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিক্টারস্‌ভেন্ড্‌ পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

## দশ

সে দিন সে রাত্রিও কেটে গেল। শঙ্কর এখন দুঃসাহসে মরীয়া হয়ে উঠেচে। যদি তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে না। দু'দিন সে কোথাও না গিয়ে তাঁবুতে বসে মন স্থির করে ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে। হঠাৎ তার মনে হোল, আলভারেজের সেই কথাটা—সল্‌স্‌বেরি...এখান থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আন্দাজ ছশো মাইল...

সল্‌স্‌বেরি।...দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সল্‌স্‌বেরি। যে করে হোক, পৌঁছুতেই হবে তাকে সল্‌স্‌বেরিতে! সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে, তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে। এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না।

\*                      \*                      \*                      \*

\*                      \*                      \*

শঙ্কর ম্যাপগুলো খুব ভালো করে দেখলে। পটু'গিজ গবর্নমেন্টের ফরেষ্ট সার্ভের ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল মেরিন্ সার্ভের তৈরী উপকূলের ম্যাপ, ভ্রমণকারী স্মার ফিলিপো ডি ফিলিপির ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে আঁকা ও জিম্ কার্টারের সহযুক্ত একথানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া নক্সা। আলভারেজ বেঁচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ বুঝতে একবারও ভাল করে চেষ্টা করেনি, এখন এদের বোঝার ওপর তায়

জীবন মরণ নির্ভর করচে। সন্স্বেরির সোজা রাস্তা বার করতে হবে। এ স্থান থেকে তার অবস্থিতি বিন্দুর দিক্ নির্ণয় করতে হবে, রিখটারস্কেইন্ড্ অরণ্যের এ গোলোক ধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে—সবই এই ম্যাপগুলির সাহায্যে।

অনেক দেখবার গুনবার পরে ও বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া নেই—এক আল্‌ভারেজের ও জিম্ কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া। তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাঙ্কেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শঙ্করের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে ভাগ বসায়।

চতুর্থ দিন শঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মত পূর্বদিকে রওনা হোল। যাবার আগে কিছু বনের ফুলের মালা গোঁথে আল্‌ভাবেজের সমাধির ওপর অর্পণ করলে।

‘বুশ্ ক্র্যাফ্ট’ বলে একটা জিনিষ আছে। সুবিস্তীর্ণ, বিজ্ঞান, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময়ে এ বিজ্ঞা জানা না থাকলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আলভারেজের সঙ্গে এতদিন ঘোবাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কিছু কিছু ‘বুশ্ ক্র্যাফ্ট’ শিখে নিয়েছিল, তবুও তার মনে সন্দেহ হোল যে, এই বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে কি অর্জন করেছে? শুধু



ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভাল হয় বন পার হতে পারে, ভাগ্য প্রসন্ন না হয়—মৃত্যু।

ছুটো তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হয়ে চলল। বন কখনো গভীর, কখনো পাতলা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতির আর শেষ নেই। শঙ্করের জানা ছিল যে, দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে বনের প্রান্তসীমায় পৌঁছানো গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এলিফ্যান্ট বা ট্রস্ক ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন নেই কোনোদিকে—শুধুই বনস্পতি আর নীচু বনঝোপ।

প্রথম দিন শেষ হোল এক নিবিড়তর অরণ্যের মধ্যে। শঙ্কর জিনিসপত্র প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসেছিল, কেবল আলভারেজের ম্যান্লিকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একখানা কবুল ও সামান্য কিছু ঔষধ সঙ্গে নিয়েছিল—আর নিয়েছিল একটা দড়ির দোলনা। তাঁবুটা যদিও খুব হালকা ছিল, কিন্তু তা সে বয়ে আনা অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে।

ছুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে সে দড়ির দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছতলায় আগুন জ্বালালে। দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল কারণ ঘুম অসম্ভব। একে ভয়ানক মশা, তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকে গাছতলার কিছুদূর দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত শুরু করলে। গভীর অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে যেন ছুটো

আগুনের, ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেলে, পালিয়ে যায়, আবার আঘট পড়ে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। শঙ্করের ভয় হোল, ঘুগিয়ে পড়লে হয়তো বা লাফ দিয়ে দোলনায় উঠে আক্রমণ ক'বে। চিতাবাঘ অতি ধূর্ত জানোয়ার। কাজেই সারারাত্রি শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে পাবলে না। তার ওপব চারিধারে নানা বস্তু-জন্তুর রব। একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালকবালিকার খিলখিল হাসির রবে তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ও চমকে জেগে উঠল। ভেলেমেয়েরা হাসে কোথায়? এই জনমানবহীন অরণ্যে বালকবালিকাদের যাতায়াত ক'বা বা এত রাত্রে হাসা উচিত নয় তো? পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় বেবুনের ডাক ঠিক ছেনেপুলের হাসির মত শোনায়, আলভারেজ একবার গল্প কবেছিল। প্রভাতে সে গাছ থেকে নেমে রওনা হোল। বৈমানিকেরা বাকে বলেন 'ফ্রাংস ব্লাইণ্ড'—সে সেভাবে বনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপব নিভব কবে, ছু চোখ বুঁজে। এই ছুদিন চলেতে সে সম্পূর্ণভাবে দিক্‌লাভ হয়ে পড়েছে—আব তার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম জ্ঞান নেই। সে বুঝলে কোনো মস্তারণে দিক্‌ ঠিক রেখে চলা কি ভীষণ কঠিন ব্যাপার। তোমার চারিপাশে সব সময়েই গাছের গুঁড়ি, অগণিত, অজস্র, তাব লেপাজোখা নেই। তোমার মাথার ওপব সব সময় ছালপালা লতাপাতায় চন্দ্রাতপ। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন গোধূলি। ক্রোশেব পর ক্রোশ যাও, ঐ একই ব্যাপার। এদিকে কম্পাস অকেজো, কি কবে দিক ঠিক রাখা যায় ?

\* \* \* \*

\* \* \* \*

পঞ্চম দিনে একটা পাছাড়ের তলায় এসে সে বিশ্বাসেব জগো থামল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ জলস্রোত গুহার ভেতর থেকে বেবিয়ে বনের মধ্যে এঁকে বোঁকে অদৃশ্য হয়েছে।

অত বড় গুহা কখনো না দেখাব দরুণ, একটা কোতুলনেব বশাবন্তী হয়েই সে জিনিষপত্র বাইবে বেখে গুহাব মধ্যে ঢুকলো। গুহাব মুখে পানিকটা আলো—ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ জ্বলে সম্বর্ণনে অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশঃ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আর ছোটো মুখ। ওপরেব দিকে টর্চ উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উঁচু। সাদা শও নুনের মত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সরু মোটা কুবি ছাদ থেকে ঝাড় লগ্ননের মত ঝুলচে।

গুহার দেওয়ালগুলো ভিজ়ে, গা বেয়ে অনেক জায়গায় জল খুব ক্ষীণভাবেব ঝবে পড়চে। শঙ্কর ডাইনের গুহায় ঢুকলো, সেটা ঢুকবার সময় সরু, কিন্তু ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে গিয়েচে। পায়ে পাথর নয়, ভিজ়ে মাটী। টর্চেব আলোয় ওর মনে হোল, গুহাটা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজেব ভূমির এক

কোণে আর একটা গুহামুখ। সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন ছুধারে পাথরের উঁচু দেওয়াল-ওয়াল। একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে এসেচে। গলিটা আঁকা বাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেচে—শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গলিটা ধরে।

ঘণ্টা দুই এতে কাটলো। তারপর সে ভাবলে, এবার ফেরা যাক। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে আব কিছুতেই সেই ত্রিভুজাকৃতি গুহাটা খুঁজে পেল না। কেন, এই তো সেই গুহা থেকেই এই সৰু গুহাটা বেরিয়েচে, সৰু গুহা তো শেষ হয়েই গেল—তবে সে ত্রিভুজ গুহা কৈ ?

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে শঙ্করের হঠাৎ কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হোল। সে গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেনি তো ? সর্বনাশ !

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে—না, ভয় পোলে 'তাব চলবে না। স্থির বুদ্ধি ভিন্ন এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। মনে পড়ল, আলভারেজ তাকে বলে দিয়েছিল, অপবিচিত স্থানে বেশীদূর অগ্রসর হবার সময়ে পথের পাশে সে যেন কোন চিহ্ন বেখে যায়, যাতে আবার সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে। এ উপদেশ সে ভুলে গিয়েছিল। এখন উপায় ?

টর্চেব আলো জ্বালতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। যদি ব্যাটারি ফুরিয়ে যায়, তবে নিকপায়। গুহার মধ্যে অন্ধকার

সূচীভেদ। সেই দুর্গিবীক্ষা অন্ধকাৰে এক পা অগ্রসৰ হওয়া অসম্ভব। পথ খুঁজে বাব কৰা তো দূৰেব কথা।

সাবাদিন কেটে গেল—ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা। এদিকে টৰ্চেৰ আলো বাঙা হযে আসচে ক্রমশঃ। ভীষণ গুমট গবম গুমহাব মধ্যে তা' ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথৰেব দেওয়াল বেয়ে যে জল চুঁয়ে পড়চে, তা' আশ্বাদ কৰা, ক্ষাব, ঈষৎ লোনা। তাৰ পৰিমাণও বেশী নয। জিব দিয়ে চোট খেতে হয় দেওয়ালেব গা থেকে।

বাইবে অন্ধকাৰ হযেচে নিশ্চয়ই, সাড়ে সাতটা বাজলো। আটটা, নটা, দশটা। তখনও শঙ্কৰ পথ হাতডাঙে। টৰ্চেৰ পুৰোণো ব্যাটাৰি জ্বলচে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবাব সে এত ক্ষীণ হযে এসেচে যে, শঙ্কৰ ভয়ে আবও উন্মাদেব মত হযে উঠল। এই আলো যতক্ষণ, তাৰ প্ৰাণেব ভবসাত ততক্ষণ—নতুবা এ বৌবৰ নবকেব মত মহা অন্ধকাৰে পথ খুঁজে পাবাব কোনো আশা নেই—স্বয়ং আলভাবেজও পাবতো না।

টৰ্চ নিবিযে, ও চুপ কৰে একখানা পাথৰেব ওপৰ বসে বহিল। এ থেকে উদ্ধাব পাওয়া যেতেও পাবতো, যদি আলো থাকতো—কিন্তু অন্ধকাৰে সে বি কৰে এখন। একবাব ভাবলৈ, বাত্ৰিটা কাটুক না, দেখা যাবে এখন। পক্ষণেই মনে হোল—তাতে আৰ কি সুবিধে হবে? এখানে দিন বাত্ৰি সমান।

অন্ধকারেই সে দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলো। হায়, হায়, কেন গুহায় ঢুকবার সময় ছোটো নতুন ব্যাটারি সঙ্গে নেয় নি! অন্ততঃ একটা দেশলাই।

যদি হিসেবে সকাল হোল। গুহার চির অন্ধকারে আলো জ্বললো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর গবসন্ন হয়ে আসচে ওর। বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি অদৃষ্টে লেখা আছে, দিনের আলো আর দেখতে হবে না। আলভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রক্ততৃষ্ণা মেটেনি, তাকেও চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। শব্দর জুতোব শুক্ণোনা চিঁবিয়ে পেয়েচে, একটা আরশুলো কি ইঁদুর, কি কঁকড়াবিছে—কোনো জীব নেই গুহার মধ্যে যে সে ধরে যায়। মাথা ক্রমশঃ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আসচে, তার জ্ঞান নেই সে কি করচে বা তার কি ঘটচে—কেবল এইটুকু মাত্র জ্ঞান রয়েছে যে, তাকে এ গুহা থেকে নে করে হোক বেরুতেই হবে, দিনের আলোর মুখ দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন নিজীব দেহেও অন্ধকারে তাতড়ে তাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়ত মরণের পূর্ব মুহূর্ত পশ্যন্ত ওইরকমই তাতড়াবে।

একবার সে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়লো। কতক্ষণ পরে সে জেগে উঠল, তা সে জানে না; দিন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘড়ি, দণ্ড, পল মুছে গিয়েচে এই ঘোর অন্ধকারে। হয়তো বা তার চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েচে, কে জানে?

ঘুমবার পরে সে যেন একটু বল পেল। আবার উঠল,

আবার চল্ল, আলভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না।....সে পথ খুঁজবে, খুঁজবে, যতক্ষণ বেঁচে আছে।

আশ্চর্য্য, সে নদীটাই বা কোথায় গেল?...গুহার মধ্যে গোলোকধাঁধায় ঘুরবার সময়ে জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে ফেলেচে। নদী দেখতে পেলো হয় তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে পারে, কারণ তার এক মুখ যেকোনো থাকুক, একটা মুখ আছে গুহার বাইরে। কিন্তু নদী তো দূরের কথা, একটা অতি ক্ষীণ জলধারার সঙ্গেও আজ তিন দিন পবিচয় নেই! জল অভাবে শঙ্কর মরতে বসেচে, কষা, লোনা, বিষাদ জল চেটে চেটে তাব জিব ফুলে উঠেচে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েচে ছাড়া কমে নি।

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুঁজতে লাগলো, ভিজ়ে দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেওলা জন্মেছে কি না—খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। না তাও নেই! পাথরের দেওয়াল সর্বত্র অনাবৃত—মাঝে মাঝে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাতলা সর পড়েচে, একটা ব্যাঙের ছাতা, কি শেওলাজাতীয় উদ্ভিদও নেই। সূর্য্যের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে না।

আরও একদিন কেটে রাত এল। এত ঘোরাঘুর করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা ঘনিয়ে এসেচে। আরও সে কি চলবে, কতক্ষণ চলবে? এতে কোন ফল নেই, এ চলার শেষ নেই। কোথায় সে চলেছে

এই গাঢ় নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে, এই ভয়ানক নিস্তর্রতার মধ্যে !  
 উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি ভয়ানক নিস্তর্রতা ! পৃথিবী  
 যেন মরে গিয়েচে, সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য্য নিবে গিয়েচে,  
 সেই মৃত পৃথিবীর জনহীন, শব্দহীন, সময়হীন, শ্মশানে সেই  
 একমাত্র প্রাণী বেঁচে আছে ।

আর বেশীক্ষণ এ-বকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাবে ।





## এগারো

শঙ্কর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কিন্তু হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে থাকবে। মোটের ওপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ঘড়িতে বারোটা—সম্ভবতঃ রাত বাবোটাই হবে। ও উঠে আবার চলতে শুরু করলে। এক জায়গায় তার সামনে একটা পাথরের দেওয়াল পড়লো—তার রাস্তা যেন আটকে বেখেচে। টর্চের বাঙা আলো একটিবার মাত্র জ্বালিয়ে সে দেখলে, যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাচ্ছিল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে এ দেওয়ালটা আড়াআড়ি ভাবে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সে কাণখাড়া করলে... অন্ধকারের মধ্যে কোথায় নেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না?...।

হাঁ... ঠিক জলের শব্দই বটে....কলু কলু, কলু কলু; ঝংগা ধারার শব্দ—যেন পাথরের ছুড়ির ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে বেধে জল বইচে কোথাও। ভাল করে শুনে ওর মনে হোল, জলের শব্দটা হচ্ছে এই পাথরের দেওয়ালের ওপারে। দেওয়ালে কাণ পেতে শুনে ওর ধারণা আরও বদ্ধমূল হোল। দেওয়াল ফুঁড়ে যাবার উপযুক্ত ফাঁক আছে কিনা, টর্চের বাঙা আলোয় অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় খুব নীচু ও সংকীর্ণ প্রাকৃতিক রন্ধ দেখতে পেল। সেখান দিয়ে

হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেক্‌লো। সমুদ্রপে  
ওপরের দিকে হাত দিয়ে বুঝ্‌লো, সেখানেটাতে দাঁড়ানো যেতে  
পারে। দাঁড়িয়ে ওঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা  
যেতেই, শ্রোতযুক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা  
ডুবে গেল।....

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নীচু হয়ে, ও প্রাণ ভবে ঠাণ্ডা জল  
পান করে নিলে। তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের  
শ্রোতের গতি লক্ষ্য করলে। এ ধরনের নিষ্কারের শ্রোতের  
উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণতঃ হয় না। টর্চ নিবিয়ে সেই  
মহা নিবিড় অন্ধকারে পায়ে পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে  
করতে অনেকক্ষণ ধরে চললো। নিষ্কার চলেচে একে নেকৈ,  
কখনও ডাইনে, কখনও বায়ে। একজায়গায় যেন সেটা তিন  
চাবটে ছোট বড় ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এদিক এদিক চলে  
গিয়েচে, ওর মনে হোল।

সেখানে এসে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। টর্চ জ্বলে  
দেখলে শ্রোত নানামুখী। আলভারেজের কথা মনে পড়লো,  
পথে চিহ্ন রেখে না গেলে, এখানে এবার গোল পাকিয়ে যাবার  
সম্ভাবনা।

নীচু হয়ে চিহ্ন রেখে যাওয়ার উপযোগী কিছু খুঁজতে গিয়ে  
দেখলে, স্বচ্ছ, নিশ্চল জলধারার এপাবে ওপারে ছপারেই  
একধরনের পাথরের লুড়ি বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের  
পাথরের লুড়ির ওপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেচে।

অনেকগুলো ছুড়ি পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখাটা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, ছুটো ছুড়ি ধারাব পাশে রাখতে রাখতে গেল। একটা স্রোত থেকে খানিকদূর গিয়ে আবার অনেকগুলো ফেক্‌ডি বেরিয়েচে। প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও ছুড়ি সাজিয়ে একটা 'S' অক্ষর তৈরী করে রাখলে।

অনেকগুলো স্রোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই যেন ঘুরে গেল। পথে চিহ্ন না বেখে গিয়েই শঙ্করের মাথা গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড় হোল। একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঢাণ্ডা কি ঠেকতেই, সে আলো জ্বলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন কুঙলী পাকিয়ে আছে। পাইথন ওব স্পর্শে আলস্য পবিত্যাগ করে মাথাটা উঠিয়ে কড়িব দানাব মত চোখে চাইতেই টর্চেব আলোয় দিশাহারা হয়ে গেল—নতুবা শঙ্করের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠতো। শঙ্কর জানে অজগর সর্প অতি ভয়ানক জন্তু—বাঘ সিংহের মুখ থেকেও হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, অজগর সর্পের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। একটাবার লেজ ছুঁড়ে পা জড়িয়ে ধরলে আর দেখতে হোত না।

এবার অন্ধকারে চলতে ওব ভয়ানক ভয় করছিল। কি জানি, আবার কোথায় কোন্ পাইথন সাপ কুঙলী পাকিয়ে আছে! ছুটো তিনটা স্রোতশাখা পরীক্ষা করে দেখবার পবে ও তার কৃত চিহ্নের সাহায্যে পুনরায় সংযোগ স্থলে ফিরে

এল। প্রধান সংযোগ স্থলে ও ছুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন  
করে বেখে গিয়েছিল। এবার ওই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে  
মনে হোল, সেটা ধরে চলতে গিয়ে দেখলে সেও সোজামুখে  
যায় নি। তাবও নানা ফেক্‌ডি বেবিষেচে, কিছুদূর গিয়েই।  
এক এক জায়গায় গুহাব ছাদ এত নীচু হয়ে নেমে এসেচে যে  
কঁজো হয়ে, কোথাও বা মাজা ঢুমে, অশীর্ষপব বুদ্ধের ভঙ্গিতে  
চলতে হয়।

তঠাৎ একজায়গায় টর্চ জ্বলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও  
শঙ্কর বুঝতে পাবলে, গুহাটা প্রধান ত্রিভুজাকৃতি—সেই  
বিভুজ গুহা, যাকে খুঁজে বাব না করতে পোবে, মৃত্যুব দ্বার  
পযান্ত যেতে হয়েছিল। একটু পদেই দেখলে বতদবে যেন  
অন্ধকারের ফ্রেমে আটা কয়েকটা নক্ষত্র জ্বলচে। গুহাব মুখ।  
এবার আব ভয় নেই। এ-যাত্রার মত সে বেচে গেল।

\* \* \* \*

\* \* \*

শঙ্কর যখন বাইবে এসে দাডাল, এখন বাত তিনটে।  
সেখানটায় গাছপালা কিছু কম, মাথাব ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ  
দেখা যায়। বৌবরের মহা অন্ধকার থেকে বাব হয়ে এসে  
বাত্রির নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোক-  
খচিত নগরপথের মত মনে হোল। প্রাণভাবে সে ভগবানকে  
ধন্যবাদ দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে।

ভোব হোল। সূর্যের আলো গাছের ডালে ডালে ফুটলো।

শঙ্কর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ড ও সে থাকবে না। পকেটে একখানা পাথরের নুড়ি তখনও ছিল, ফেলে না দিয়ে গুহার বিপদের আরক স্বরূপ সেখানা সে কাছে রেখে দিলে।

পরদিন এলিফ্যান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই সন্ধ্যার পূর্বে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল। রাত্রে শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে। সামনে যে মুক্ত প্রান্তরবৎ দেশ পড়লো, এখান থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, একেবারে জাম্বেসী নদীর তীর পর্য্যন্ত। এই তিনশো মাইলের খানিকটা পড়েচে বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় ১৭৫ মাইল, অতি ভীষণ, জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। মিলিটারি ম্যাপ থেকে আল্‌ভারেজ নোট কবেচে যে, এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ্য করে একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে, মাঝামাঝি পান্ন হতে যাওয়ার মানেই মৃত্যু। ম্যাপে এর নাম দিয়েচে ‘তৃষ্ণার দেশ’ ( Thirstland Trek )। রোডেসিয়া পৌছতে পারলে যাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সে সব স্থানে মানুষ আছে।

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলে। পথের এই ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-ভারা হয়ে প লো না। এই পথে আল্‌ভারেজ একা গিয়ে সল্‌স্‌বেরি থেকে টোটা ও খাবার কিনে আনবে বলেছিল। বাঘটি বছরেব বৃদ্ধ যা পারবে বলে স্থির করেছিল, সে তা থেকে পিছিয়ে যাবে ?

কিন্তু সাহস ও নিভীকতা এক জিনিস, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা শঙ্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে কিছুই বোঝে না। মিলিটারি ম্যাপগুলোতে ছোটো মরুমধ্যস্থ কূপের অবস্থান-স্থানের ল্যাটিটিউড্, লঙ্গিটিউড্ দেওয়া আছে, “ম্যাগনেটিক্ নর্থ” আর “ট্রু নর্থ” ঘটিত কি একটা গোলমালে অঙ্ক কসে বাব করতে অনভাবের, শঙ্কর দেখেচে কিন্তু শিখে নেননি।

সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি দিতে প্রস্তুত হোল। ফলে, তঁর দিন যেতে না যেতেই শঙ্কর সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ম্যাপ দৃষ্টে যে কোনো অভিজ্ঞ লোক যে জলাশয় চাপ খুঁজে খুঁজে বাব করতে পাবতো— শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার জন্য ফুরিয়ে এসেচে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে জীবন বিপদাপন্ন হবে।

প্রথমতঃ শুধু প্রাণের আর পাঠাড, ক্যাকটাস্ ও হউফোর্বিয়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তূপ। তারপর কি ভীষণ কষ্টের সে পথ চলল। খাওয়া নেই, জল নেই, পথ ঠিক নেই, মানুষ্যের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন শুধু সুদূর, শূন্য, দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ পথ-যাত্রা—মাথাব ওপর আগুনের মত সূর্য, পায়েব নীচে বালি পাথর যেন জ্বলন্ত অঙ্গার

সূর্য্য উঠ্চে, অস্ত যাচ্ছে—নক্ষত্র উঠ্চে, চাঁদ উঠ্চে—আবার অস্ত যাচ্ছে। মরুভূমির গিরগিটি একঘেয়ে সুরে ডাক্চে, ঝিঁ ঝিঁ ডাক্চে—সন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে।

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল অতিক্রম করা হোল তার হিসেব নেই। খাও ছ'-একটা পাখী, কখনো বা মরুভূমির বুজার্ড শকুনি, যার মাংস জঠর ও বিষাদ। এমন-কি একদিন একটা পাহাড়ী বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে, যার দংশনে মৃত্যু—তাও যেন পরম সুখাচ্ছ, মিললে মহা সৌভাগ্য।

ছ'দিন ঘোর তৃণায় কষ্ট পাবার পরে, পাহাড়ের ফাটলে একটা জলাশয় পাওয়া গেল। কিন্তু জলের চেহারা লাল, কতকগুলো কি পোকা ভাস্চে জলে—ডাঙায় একটা কি জন্ম মরে পচে ঢোল হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে।

দিনের পর দিন কাট্চে, মাস গেল, কি সপ্তাহ গেল, কি বছর গেল, হিসেব সেই। শঙ্কর রোগা হয়ে গিয়েচে শুকিয়ে। কোথায় চলেচে তার কিছুই ঠিক নেই—শুধু সামনের দিকে যেতে হবে এই সে জানে। সামনের দিকেই ভারতবর্ষ—বাংলা দেশ।

তারপর পড়লো আসল মরু, কালাহারি মরুভূমির এক অংশ। দূর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠ্লে। মানুষে কি করে পার হতে পারে এই অগ্নিদগ্ধ প্রান্তর! শুধুই বালির পাহাড়, তাম্রাভ কটা বালিব

সমুদ্র। ধু ধু করে যেন জ্বলচে ছুপুরেব রোদে। মরুর কিনারায় প্রথম দিনেই ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রী উত্তাপ উঠল থার্মোমিটারে।

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েচে উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁসে ছাড়া কেউ এই মরুভূমি মাঝামাঝি পার হতে যাবে না। গেলেই মৃত্যু, কাবণ সেখানে জল একদম নেই। জল যে উত্তর-পূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে ত্রিশ মাইল, সত্তর মাইল ও নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনটি স্বাভাবিক উণুই আছে—যাতে জল পাওয়া যায়। ঐ উণুইগুলি প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। এইজন্তো মিলিটারী ম্যাপে ওদের অবস্থান স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে।

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বাব কবর্তে পারবো না। সেক্সট্যান্ট আছে, নক্ষত্রের চার্ট আছে কিন্তু তাদেব ব্যবহার সে জানে না। যা হয় হবে, ভগবান ভবসা। তবে যতদূর সম্ভব উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁসে যাবার চেষ্টা সে করলে।

তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উণুই দেখতে পেল। জল কাদাগোলা, আগুনের মত গরম, কিন্তু তাই তখন অমৃতের মত দ্বর্লভ। মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে উঠলো। কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। আগে বাত্রে আলো জ্বাললে দু-একটা কীটপতঙ্গ আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসতো, ক্রমে তাও আর আসে না।

দিনে উত্তাপ যেমন ভীষণ, রাত্রে তেমনি শীত। শেষ



রাত্রে শীতে হাত-পা জমে যায় এমন অবস্থা, অথচ ক্রমশঃ আগুন জ্বালবার উপায় গেল, কারণ আলানি কাঠ একেবারেই নেই। কয়েক দিনের মধ্যে সঞ্চিত জ্বল গেল ফুরিয়ে। সে সুবিস্তীর্ণ বালুকা সমুদ্রে একটা পরিচিত বালুকণা খুঁজে বার করা যতদূর অসম্ভব, তার চেয়ে অসম্ভব ক্ষুদ্র এক হাত-দুই ব্যাসবিশিষ্ট জলের উণুই বার করা।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তৃণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠল। এতক্ষণে শঙ্কর বুঝেচে যে, এ ভীষণ মরুভূমি একা পার হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। সে এমন জায়গায় এসে পড়েচে, যেখান থেকে ফিরবার উপায়ও নেই।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপর উঠে সে দেখলে, চারিদিকে শুধুই কটা বালির পাহাড়, পূর্বদিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গিয়েচে। পশ্চিমে সূর্য্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ সূর্য্যাস্তের আভায়ে লাল। কিছুদূরে একটা ছোট ঢিবির মত পাহাড় এবং দূর থেকে মনে হোল 'একটা গুহাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটেব ছোট ঢিবি এদেশে সর্বত্র—ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় এদের নাম “Kopje” অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। রাত্রে শীতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শঙ্কর সেই গুহায় আশ্রয় নিলে।

এইখানে এক ব্যপার ঘটল।



## বারো

গুহাব মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জ্বলে (নতুন ব্যাটাবি ভাব কাছে ডজন দুই ছিল) দেখলে গুহাটা ছোট, মেজেটাতে ছোট ছোট পাথর ছড়ানো, বেশ একটা ছোটখাট ঘরের মত। গুহাব এক কোণে ওর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে বইল। একটা ছোট কাঠের পিপে! এখানে কি করে এল কাঠের পিপে।

এগিয়ে হুঁপা গিয়েই সে চমকে উঠল। গুহার দেওয়ালের ধাব খেসে শায়িত অবস্থায় একটা সাদা নরকঙ্কাল, তার মুণ্ডটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো। কঙ্কালের আশে পাশে কালো কালো থলে ছেড়ার মত জিনিষ, বোধ হয় সেগুলো পশমের কোটের অংশ। ছ'খানা বুট জুতো কঙ্কালের গায়ে এখনও লাগানো। একপাশে একটা মবচে-পডা বন্দুক।

পিপেটার পাশে একটা ছিপি-আটা বোতল। বোতলের মধ্যে একখানা কাগজ। ছিপিটা খুলে কাগজখানা বাব কবে দেখলে, তাতে ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

পিপেটাতে কি আছে দেখবার জগ্রে যেমন সে সেটা নাড়াতে গিয়েচে, অমনি পিপের নীচে থেকে একটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে ওর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে একটা প্কাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক উচু হয়ে

ঠেলে উঠল। বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক



সেকেণ্ড দেরী করেছিল। সেই এক সেকেণ্ডের দেরী করার  
জন্মে শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হোল। পরমুহূর্তেই শঙ্করের '৪৫

অটোমেটিক কোণ্ট্‌ গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অতবড় ভীষণ বিষধর 'স্মাণ্ড্‌ ভাইপার' এর মাথাটা ভিন্নভিন্ন হয়ে, রক্ত-মাংস খানিকটা পিপের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেওয়ালে ছিটকে লাগলো। আল্‌ভারেজ ওকে শিথিয়েছিল, পথে সর্বদা ছাতিয়ার তৈরী রাখবে। এ উপদেশ অনেকবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অদ্ভুত পরিভ্রাণ! সব দিক থেকেই। পিপেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একটু জল তখনও আছে। খুব কালো শিউ গোলায় মত রং বটে, তবুও জল। ছোট পিপেটা উচু করে তুলে ধরে, পিপের ভিপি খুলে ঢক্ ঢক্ কবে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মত জল আকর্ষণ পান করলে। তারপর সে টাচ্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে। পুরো পাঁচ ছাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ। এ ধরনের সাপ নরুভূমির বালির মধ্যে শরীর লুকিয়ে শুধু মুণ্ডটা ওপরে তুলে থাকে—অতি মারাত্মক রকমের বিষাক্ত সর্প।

এইবার বোতলের মধোর কাগজখানা খুলে মন দিয়ে পড়লে। যে ছোট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে—বোতলের মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল। কাগজখানাতে লেখা আছে...

“আমার মৃত্যু নিকট। আজিই আমাব শেষ রাত্রি। যদি আমার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর নরুভূমির পথে যেতে যেতে এই গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে সম্ভবতঃ এই কাগজ তাঁর হাতে পড়বে।

আমার গাথাটা দিন ছুই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা গিয়েচে। এক পিপে জল তার পিঠে ছিল, সেটা আমি এই গুহাব মধ্যে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি, যদিও জ্বরে আমার শরীর অবসন্ন। মাথা তুলবার শক্তি নেই। তাব ওপর অনাহারে শবীর আগে থেকেই দুর্বল।

আমার বয়স ২৬ বৎসব। আমার নাম আন্তিলিও গান্টি। ফ্লোরেন্সের গান্টি বংশে আমার জন্ম। বিখ্যাত নাবিক রিওলিনো কাভালকান্টি গান্টি—যিনি লেপাণ্টোব যুদ্ধে তুর্কীদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তিনি আমার একজন পূর্বপুরুষ।

বোম ও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ কবেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভবঘূর্বে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায়,—যা আমাদের বংশগত নেশা। ডাচ্‌ইণ্ডিৎ যাবাব পথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হোল।

আমরা সাতজন লোক অতিকষ্টে ডাঙা পেলাম। যোব জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রিকার এই পশ্চিম উপকূল। জঙ্গলের মধ্যে শেফুজাতিব একগ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় ছ'মাস সেখানে থাকি। এখানেই নৈদেবাৎ এক অদ্ভুত হীরাব খনিব গল্প শুনলাম। পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পর্বত ও ভীষণ আবণ্য অঞ্চলে নাকি এই হীরাব খনি অবস্থিত।

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরাব খনি যে কবে হোক, বাব কবতে হবেই। আমাকে ওবা দলের অধিনায়ক করলে—তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ

অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে। সে গ্রামের কোন লোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হোল না। তারা বলে, তারা কখনও সে জায়গায় যায় নি, কোথায় তা জানে না, বিশেষতঃ এক উপদেবতা নাকি সে বনের রক্ষক। সেখান থেকে শীরা নিয়ে কেউ আসতে পারবে না।

আমরা দমবার পাত্র নষ্ট। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে বেঘোরে ছুঁজন সঙ্গী মারা গেল। বাকী চারজন আর অগ্রসর হতে চায় না। আমি দলের অধ্যক্ষ, গান্ধি বংশে আমার জন্ম, পিছু হটতে জানি না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে এই জানি। আমি ফিরতে চাইলাম না।

শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। আজ রাত্রেই আসবে সে নিরবয়ব মৃত্যুদূত! বড় সুন্দর আমাদের ছোট্ট হৃদ সেরিনো লাগানো, ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কাষ্টোনি রিওলিনি। এতদূর থেকেও আমি সেরিনো লাগানোর তীরবর্তী কমলানবর বাগানের লেবুফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি। ছোট্ট যে গিজ্জাটি পাগাড়ের নীচেই, তার রূপোর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি।

না, এসব কি আবোল তাবোল লিখচি জ্বরের ঘোরে। আসল কথাটা বলি। কতক্ষণই বা আর লিখবো?

আমরা সে পর্বতমালা, সে মহাচূর্গম অরণ্যে গিয়েছিলাম। সে খনি বার করেছিলাম। যে নদীর তীরে শীরা পাওয়া যায়, এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপত্তি

স্থান। আমিই সেই গুহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তীরে ও জলের মধ্যে পাথরের নুড়ির মত অজস্র হীরা ছড়ানো দেখতে পাই। প্রত্যেক নুড়িটী টেট্রাহেড্রন ক্রিষ্ট্যাল, স্বচ্ছ ও হবিদ্রাভ ; লণ্ডন ও আমস্টার্ডামের বাজারে এমন হীরা নেই।

এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহাব মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে আবছায়া ভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা! জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে যেসেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবতঃ বাস করে। হীরার খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জগুই বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরাব সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি কুক্ষণেই সঙ্গীদেব কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম। ওদেব নিয়ে আবার যখন সে গুহায় ঢুকি, হীরার খনি খুঁজে পেলাম না। একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, তার ওপরে বহুমুখী নদী, কোন স্রোতটার ধারা হীরাব রাশির ওপর দিয়ে বইছে, কিছুতেই বার করতে পারলাম না আর।

আমার সঙ্গী বা বন্ধুর, জাহাজের খালাসী। ভাবলে, ওদের ফাঁকি দিলাম বুঝি। আমি একা নেবো এই বুঝি আমার মতলব। ওরা কি ষড়যন্ত্র আটলে জানিনে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা চারজনে মিলে অতর্কিতে ছুরি খুলে আমায় আক্রমণ করলে।

কিন্তু তারা জানতো না আমাকে, আন্তিলিও গান্তিকে। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত বইছে, আমার পূর্বপুরুষ রিওলিনি কাভাল কান্তি গান্তির, যিনি লেপাণ্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু বর্ষরকে নরকে পাঠিয়েছিলেন। সাণ্টা কাটালিনার সাময়িক বিজ্ঞালয়ে যখন আমি ছাত্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ Fencer এটোনিও ড্রেফুসকে ছোরার ডুয়েলে জখম করি। আমার ছোরার আঘাতে ওরা দু'জন মরে গেল, দু'জন সাংঘাতিক ঘায়েল হোল, নিজেও আমি চোট পেলাম ওদের হাতে। আহত বদ্‌মাইস দুটোও সেই রাত্রে ভবলীলা শেষ করল। ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলক ধাঁধার ভেতর থেকে খনি খুঁজে হয়তো বার করতে পারব না। তাছাড়া আমি সাংঘাতিক আহত, আমার সভ্যজগতে পৌঁছতেই হবে। পূর্বদিকের পাথে ডাচ্ উপনিবেশে পৌঁছবো বলে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে পারলুম না। ওরা তলপেটে ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিষিয়ে। সেই সঙ্গে জ্বর। মাস্তুষের কি লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের ফাঁকি দেওয়ার কথা আমার মনে আসে নি!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ-বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয়ই সভ্য মানুষ ও খুষ্ঠান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি



যেন ঋষ্টানের উপযুক্ত কবর দেন। এই অন্তঃকণ্ঠের বদলে ঐ খনির স্বত্ব আমি তাঁকে দিলাম। রানী শেবার শনভাণ্ডারও ঐ খনির কাছে কিছু নয়!

প্রাণ গেল, যাক্, কি করবো? কিন্তু কি ভয়ানক মরুভূমি এ! একটা ঝাঁঝি পোকাকর ডাক পর্য্যন্ত নেই কোনোদিকে! এমন সব জায়গাও থাকে পৃথিবীতে! আমার আজ কেবলই মনে হচ্ছে, পপুলার ঘেরা সেরিনো লাগ্রানো হৃদ আঁব দেখবো না, তার ধারে যে চতুর্দশ শতাব্দির গির্জাটা, তার সেই বড় কপোর ঘটার পবিত্র ধ্বনি, পাহাড়ের ওপরে আমাদের যে প্রাচীন প্রাসাদ কাষ্টেলি রিওলিনি, মূর্তদের দুর্গের মত দেখায় ....দূরে আম্ভ্রিয়ার সবুজ মাঠ ও ড্রাক্সাক্সের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে...যাক্, আঁবাব কি প্রাণাপ বকচি।

গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগণিত তারা প্রাণভবে দেখচি শেষ বারের জন্তে।...সাধু ফ্রাঙ্কোব সেই সৌর স্তোত্র মনে পড়চে :—সুত হোন্ প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থিৰ বায়ু তরে, ভগিনী মেদিনী তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশেব তরে, তারকা সমূহ তরে, সুদিন কুদিন তরে, দণ্ডের মরণ তরে।

আর একটা কথা। আমাদের দুই পায়ে জুতার মধ্যে পাঁচ-খানা বড় ছীরা লুকানো আছে, তোমায় তা দিলাম হে অজানা

পথিক বন্ধু। আমার শেষ অনুরোধটি ভুলো না। জননী মেরী তোমার মঙ্গল করুন।

কম্যাণ্ডার আন্তিলিও গান্ভি

১৮৮০ সাল। সম্ভবতঃ মার্চ মাস।

\*                      \*                      \*                      \*

\*                      \*                      \*

“ হতভাগ্য যুবক !

তাব মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসব চলে গিয়েছে। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায় নি, গেলেও গুহাটার মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার চিঠিখানা মানুষের হাতে পড়লো।

আশ্চর্য্য এই যে কাঠের পিপেটাতে শিশবড়র পবেও জল ছিল কি করে ?

কিন্তু কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হোল, এই লেখায় বর্ণিত ঐটেই সেই গুহা—সে নিজে যেখানে পথ হারিয়ে মারা যেতে বসেছিল ! তারপরে সে কৌতূহলের সঙ্গে কঙ্কালের পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই পাচখানা বড বড় পাথর বেরিয়ে পড়লো। এ অবিকল সেই পাথরের নুড়ির মত, যা এক পকেট কুড়িয়ে অন্ধকারে গুহার মধ্যে সে পথে চিহ্ন করে-ছিল এবং যার একখানা তার কাছে রয়েছে। এ পাথরের নুড়ি তো রাশি রাশি সে দেখেছে গুহার মধ্যের সেই অন্ধকার-ময়ী নদীর জলস্রোতের নীচে, তার ছই তীরে ! কে জানতো

যে শীরার খনি খুঁজতে সে ও আলভারেজ সাতসমুদ্র তেরো নদী পাব হয়ে এসে, ছ'মাস ধরে রিখটারস্কেল পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে গিয়েচে—এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সেখানে গিয়ে পড়বে! শীরা যে এমন রাশি রাশি পড়ে থাকে পাথরের নুড়ির মত—তাই বা কে ভেবেছিল! আগে এ সব জানা থাকলে, পাথরের নুড়ি সে ছ'পকেট ভরে কুড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসতো।

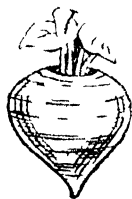
কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গিয়েচে যে, সে রত্নখনির গুহা যে কোথায়, কোন্ দিকে তার কোনো নক্সা করে আনে নি বা সেখানে কোনো চিহ্ন বেগে আসে নি, যাতে আবার তাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সেই সুবিস্তীর্ণ পর্বত ও অরণ্য অঞ্চলের কোন্ জায়গায় সেই গুহাটা দৈবাৎ সে দেখেছিল, তাকি তাব ঠিক আছে, না ভবিষ্যতে সে আবার সে জায়গা বার করতে পারবে? এ যুবকও তো কোনো নক্সা করেনি, কিন্তু এ সা বাণিক আহত হয়েছিল রত্নখনি আবিষ্কার করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। হয় তো এ যা বার করতে পারতো নক্সা না দেখে - সে তা পারবে না।

হঠাৎ আলভারেজের মৃত্যুর পূর্বের কথা শঙ্করের মনে পড়লো। সে বলেছিল—চলো যাই, শঙ্কর, গুহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার লুকোনো আছে! তুমি দেখতে পাচ্চ না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

শঙ্কৰ তাৰ পৰে গুহাৰ মধ্যলৈ নবকঙ্কালটো সমাধিস্থ কৰিলে।  
পিপেটা ভেঙে ফেলে তাৰই দু'খানা কাঠে মৰচে-পড়া পেৰেক  
ঠেকে ক্ৰুশ তৈৰী কৰিলে ও সমাধিব ওপৰ সেই ক্ৰুশটো পুতিলে।  
এ ছাড়া খুঁটখুঁটিয়াচাবীকে সমাধিস্থ কৰাবাৰ অত্ৰ কোনো বীতি  
তাৰ জানা নাই। তাৰপৰে সে ভগবানেৰ কাছে প্ৰাৰ্থনা  
কৰিলে, এই মৃত যুবকেৰ আত্মাৰ শান্তিৰ জন্ম।

এ সব শেষ কৰতে সাবাদিনটো কেটে গেল। বাত্ৰে বিশ্ৰাম  
কৰে পৰদিন আৰম্ভ কৰা বওনা হ'ল। কঙ্কালেৰ চিঠি খানা  
ও হীৰাগুলি যত কৰে সজে নিল।

তবে তাৰ মনে হয়, ও অভিশপ্ত হীৰাৰ খনিৰ সন্ধান যি  
গিয়েচ, সে আৰ ফেৰনি, গাভ্ৰিলিও গান্ধি ও তাৰ সঙ্গীৰ  
মৰেচ, জিম কাৰ্টাৰ মৰেচ, আনভাবেজ মৰেচ। এৰ আগেই  
বা কত লোক মৰেচ, তাৰ ঠিক কি? এইবাব তাৰ  
পালা। এই মৰুভূমিতেই তাৰ শেষ, এই বাৰ ইটালিয়ান  
যুবকেৰ মত।



## তেরে।

ছপুরের রোদে যখন দিকে দিগন্তে আগুন জ্বলে উঠলো, একটা ছোট্ট পাথরের চিবির আড়ালে সে আশ্রয় নিলে। ১৩৫° ডিগ্রি উত্তাপ উঠেচে তাপমান যত্নে, বস্তুমাংসের মানুষের পক্ষে এ উত্তাপে পথহাঁটা চলে না। যদি সে কোনরকমে এই ভয়ানক মরুভূমির হাত এড়াতে পারতো, তবে হয়তো জীবন্য অবস্থায় মানুষের আবাসে পৌঁছুতেও পারতো। সে ভয় করে শুধু এই মরুভূমি, সে জানে কালাহারী মরু বড় বড় সিংহের বিচরণ-ভূমি। তার হাতে রাইফেল আছে—রাতছপুরেও একা যত বড় সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে না—কিন্তু ভয় হয় তৃষ্ণা রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে পবিত্রাণ নেই। ছপুবে সে ছ'বার মরীচিকা দেখলে। এতদিন মরুপথে আসতেও এ আশ্চর্য্য নৈসর্গিক দৃশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়ে ছিল মরীচিকার কথা। একবার উত্তর পূর্ব কোণে, একবার দক্ষিণ পূর্ব কোণে, দুই মরীচিকাই কিন্তু প্রায় এক রকম—অর্থাৎ একটা বড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বা গিজ্জা, চারিপাশে খজ্জুরকুঞ্জ, সামনে বিস্তৃত জলাশয়। উত্তরপূর্ব কোণের মরীচিকাটা বেশী স্পষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে দূরদিগন্তে মেঘমানার মত পর্বতমালা দেখা গেল। শঙ্কর নিজের চোথকে বিশ্বাস করতে পারলে না। পূর্বদিকে একটাই মাত্র বড় পর্বত, এখান থেকে দেখা পাওয়া

সম্ভব, দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রাস্তবর্তী চিমনিমানি পর্বতমালা। তাহোলে কি বুঝতে হবে যে, সে বিশাল কালাহারি পদব্রজে পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেচে ! না ও-ও মরীচিকা ?

কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রি সে দূর-পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেল। অসংখ্য ধন্যবাদ হে ভগবান, মরীচিকা নয় তবে। জ্যোৎস্নারাত্রি কেউ কখনো মরীচিকা দেখে নি।

তবে কি প্রাণের আশা আছে ? আজ পৃথিবীর বৃহত্তম বহু খনিব মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও ছুঃসাহসেব বলে সে তার স্বপ্ন অঙ্জন করেছে। দরিদ্র বাংলা মায়ের বকে সে যদি আজ বেঁচে ফেবে।

ছাঁদেব দিন বিকালে সে এসে পর্বতের নীচে পৌঁছলো। তখন সে দেখলে, পর্বত পার হওয়া ছাড়া ওপারে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নহ। নইলে ২৫ মাইল মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে আসতে হবে। মরুভূমি মধো সে আব কিছুতেই যেতে রাজি নয়। সে পাছাড় পার হয়েই যাবে।

এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে। সে ভুলে গেল যে সাড়ে বারোহাজার ফুট একটা পর্বতমালা ডিঙিয়ে ওপারে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রিখটারস্কেল পার হওয়ার মতই শক্ত। তাব চেয়েও শক্ত, কারণ সেখানে আলভারেজ ছিল, এখানে সে একা।

শঙ্কর ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারলে না, ফলে চিমানিমানি পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসলো, ভীষণ প্রজ্বলন্ত কালাহারি পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়নি।

চিমানিমানি পর্বতে জঙ্গল খুব বেশী ঘন নয়। শঙ্কর প্রথম দিন অনেকটা উঠলো—তারপর একটা জায়গায় গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে কোনদিকে যাবার উপায় নেই। কোন পথটা দিয়ে উঠেছিল, সেটাও আব খুজে পেলো না—তার মনে হোল, সে সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠেছিল, তাব নিশ ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসেছে। কেন যে এমন হোল, এর কারণ কিছুতেই সে বার করতে পারলে না। কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল, কখনও উঠে, কখনও নামে, সূর্য্য দেখে দিক ঠিক করে নিচ্ছে, কিন্তু সাত আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতদিন লাগচে কেন ?

তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল। তার আগের দিন একখানা আল্গা পাথর গড়িয়ে তার পায়ে চোট লেগে-ছিল। তখন তর্ভ কিছু হয়নি, পরদিন সকালে আর সে শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাঁটু ফুলেচে, বেদনাও খুব। দুর্গম পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব। পাহাড়ের একটা ঝরণা থেকে উঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনেছিল, তাই একটু একটু করে খেয়ে চালাচ্ছে। পায়ের বেদনা কমে না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। বেশীদূর যাওয়া

চলবে না। সামান্য একটু আধটু চলাফেরা করতেই হবে খাওয়া ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়েই এই স্থানটা যেন খানিকটা সমতলভূমির মত, তাই রক্ষা।

এই সব অবস্থায়, এই মনুষ্যবাসহীন পাহাড়ে বিপদ তো পড়ে পড়েই। একা এ পাহাড় উপত্যকায় গেলে যে কোনো ইউরোপীয় পর্যটকেরও ঠিক এইরকম বিপদ ঘটতে পারতো।

শঙ্কর আর পাবে না। ওর হৃৎপিণ্ডে কি একটা রোগ হয়েছে, একটু হাঁটলেই ধড়াস্ ধড়াস্ করে হৃৎপিণ্ডটা পাজরায় ধাক্কা মাবে। অমানুষিক পথশ্রমে, দুর্ভাবনায়, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, কখনও বা অনাহারের কষ্টে, ওর শরীরে কিছু নেই।

চারদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। খাওয়া নেই, কাল থেকে। রাইফেল সঙ্গে আছে, কিন্তু একটা বস্তু জন্তুর দেখা নেই। ছুপুরে একটা হরিণকে চব্বতে দেখে ভবসা হয়েছিল, কিন্তু রাইফেলটা তখন ছিল ৫০ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে হরিণটা পালিয়ে গেল। জল খুব সামান্যই আছে চামড়ার বোতলে। এ অবস্থায় নেমে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কি ক'বে? হাঁটুটা আরও ফুলেচে। বেদনা এত বেশী যে, একটু চলাফেরা কবলেই মাথার শির পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ে যন্ত্রণায়।

পরিস্কার আকাশতলে আর্দ্রতাপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের গুণে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিকচক্রবালে মেঘলা



করে ঘিরেচে নীল পর্বতমালা দূরে দূরে। দক্ষিণ পশ্চিমে দিগন্ত বিস্তীর্ণ কালাহারী। দক্ষিণে ওয়াহকুহক পর্বত, তারও অনেক পেছনে মেঘেব মত দৃশ্যমান পল ক্রুগার পর্বতমালা— সন্সবেরির দিকে কিছু দেখা যায় না, চিমনিমানি পর্বতের এক উচ্চতর শৃঙ্গ সেদিকে দৃষ্টি আটকেচে।

আজ ছপুর থেকে ওর মাথার ওপর শকুনির দল উড়েচে। এতদিন এত বিপদেও শঙ্করের যত হয় নি, আজ শকুনির দল মাথার ওপর উড়তে দেখে শঙ্করের সত্যি ভয় হয়েছে। ওরা তাহোলে কি বুঝেচে যে শিকার জুটবার বেশী দেরী নেই?

সন্ধ্যার কিছু পরে কি একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, পাশের শিলাখণ্ডের আড়ালে একটা দূসর রংয়ের নেকড়ে বাঘ —নেকড়ের লম্বা ছুঁচালো কাণ দুটো খাড়া হয়ে আছে, সাদা সাদা দাঁতের ওপর দিয়ে রাঙা জিবটা অনেকখানি বাব হয়ে লক্ লক্ করচে। চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে পাথরের আড়াল থেকে সরে দূরে পালালো।

নেকড়ে বাঘটাও তাহোলে কি বুঝেচে? পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পাবে।

হাড় ভাঙ্গা শীত পড়লো রাত্রে। ও কিছু কাঠকুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বাললে। অগ্নিকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার বাইরে ঘন অন্ধকার।

কি একটা জন্তু এসে অগ্নিকুণ্ড থেকে কিছু দূরে অন্ধকারে দেহ মিশিয়ে চুপ করে বসলো। কোয়োট, বন্যকুকুব জাতীয়

জন্তু। ক্রমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দশ পনেরোটা এসে জমা হোল। অন্ধকারে তার চারিধার ঘিরে নিঃশব্দে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের প্রতীক্ষা করচে।

কি সব অমঙ্গল জনক দৃশ্য।

ভয়ে ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। সত্যিই কি এতদিনে তারও মৃত্যু ঘনিযে এসেচে।

এতদিন পরে এল তাহোলে! সে-ও পারলে না রিখটার্স-ভেন্ড্ থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে!

উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে। হীরের খনি বাদ যাক্, তার সঙ্গে যে ছ'খানা হীরে রয়েছে, তার দাম অন্ততঃ ছ' তিন লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই হবে। তার গরীব গ্রামে, গরীব বাপ মায়ের বাড়ী যদি এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারতো... কত গরীবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারতো, গ্রামের কত দরিদ্র কুমারীকে বিবাহের যৌতুক দিয়ে ভাল পাত্রের বিবাহ দিত, কত সহায়হীন বৃদ্ধ বৃদ্ধার শেষ দিন ক'টা নিশ্চিত করে তুলতে পারতো...

কিন্তু সে সব ভেবে কি হবে, যা হবার নয়? তার চেয়ে এই অপূর্ব রাত্রির নক্ষত্রালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল পর্বত ও মরু ভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রূপ, মৃত্যুর আগে শঙ্করও চায় চোখ ভরে দেখছে, সেই ইটালিয়ান যুবক গান্ধির মত। ওরা যে অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা সবাই,

আন্তিলিও গান্ধি ও তার সঙ্গীরা, জিম্ কার্টার, আলভারেজ, সে...

রাত গভীর হয়েছে। কি ভীষণ শীত!...একবার সে চেয়ে দেখলে, কোয়াটগলো এরি মধ্যে কখন আরও নিকটে সরে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগুলো জ্বলচে। শঙ্কর একখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই ওরা সব দূরে সরে গেল—কিন্তু কি নিঃশব্দ ওদের গতিবিধি আর কি অসীম তাদের ধৈর্য্য! শঙ্করের মনে হোল, ওরা জানে শিকার ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় সেই ধূসর নেক্‌ড়ে বাঘটাও ছ' ছ'বার এসে কোয়াটদের পেছনে অন্ধকারে বসে দেখে গিয়েছে।

একটুও ঘুমুতে ভরসা হোল না ওর। কি জানি, কোয়াট আর নেক্‌ডের দল হয়তো তাহোলে জীবন্তই তাকে ছিঁড়ে খাবে মৃত মনে করে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে তাকে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসলে উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোয়াটগুলো এগিয়ে এসে বসে, ও জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারতেই সরে যায়...ছ' একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিলে....হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলচে!

কি ভয়ানক অবস্থাতে পড়েছে। জনবিরল বর্ষের দেশের জনশূন্য পর্বতের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশক্তি-

হীন অবস্থায় বসে....গভীর রাত ঘোর অন্ধকার....সামান্য আগুন জ্বলচে....মাথার ওপর জলকণাশূন্য স্তব্ধ বায়ুমণ্ডলের গুণে আকাশের অগণ্য তারা জ্বল্ জ্বল্ করচে যেন ইলেক্ট্রিক আলোর মত....নীচে তার চারিধার ঘিরে অন্ধকারে তার মাংসলোলূপ নীরব কোয়োট, হায়েনার দল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও মনে হোল, বাংলার পাড়ারগায়ে  
\* ম্যালেরিয়ায় খুঁকে সে মরচে না। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু।  
পদব্রজে কালাহারি মরুভূমি পায় হয়েচে সে—একা। মরে  
গিয়ে চিমনিমানি পর্বতের শিলায় নাম খুঁদে রেখে যাবে।  
সে একজন বিশিষ্ট ভ্রমণকারী ও আবিষ্কারক। অত বড়  
হীরের খনি সেই তো খুঁজে বার করেছে? আলভায়েজ্ মারা  
যাওয়াব পরে, সেই বিশাল অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের গোলোক  
ধাঁধা থেকে তো সে একাই বার হতে পাবে এত দূর এসেচে!  
এখন সে নিরুপায়, অমুস্থ, চলৎশক্তি রহিত। তবুও সে যুঝচে,  
ভয় তো পায় নি, সাহস তো হারায় নি। কাপুরুষ, ভীক  
নয় সে। জীবন মৃত্যু তো অদৃষ্টের খেলা। না বাঁচলে আর  
তার দোষ কি?

\* \* \* \*

দীর্ঘ রাত্রি কেটে গিয়ে পূবদিকে ফরসা হোল। সঙ্গে  
সঙ্গে বন্য জন্তুর দল কোথায় পালালো। বেলা বাড়চে,  
আবার নির্মম সূর্য জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিতে শুরু করচে দিক্  
বিদিক্। সঙ্গে সঙ্গে শকুনির দল কোথা থেকে এসে হাজির।

কেউ মাথার ওপর ঘুরচে, কেউ বা দূরে দূরে গাছের ডালে কি পাথরের ওপরে বসেচে—খুব ধীরভাবে প্রতীক্ষা করচে। ওরা যেন বলচে—কোথায় যাবে বাছাধন? যে ক’দিন লাফালাফি করবে, করে নাও। আমরা বসি, এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই আমাদের।

শঙ্করের খিদে নেই। খাবার ইচ্ছেও নেই। তবুও সে গুলি করে একটা শকুনি মারলে। রৌদ্র ভীষণ চড়েচে। আগুন-তাতা পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না! এ পর্বতও মরুভূমির সামিল, খাচ্চ এখানে মেলে না, জলও না। সে মরা শকুনিটা নিয়ে এসে আগুন জ্বলে ঝলসাতে বসলো। এব আগে মরুভূমির মধ্যেও সে শকুনির মাংস খেয়েচে। এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে। শকুনিগুলো এসে আবার মাথার ওপর জুটেচে।

তার নিজের ছায়া পড়েচে পাথরের গায়ে, সে নির্জ্ঞান স্থানে শঙ্করের উদ্ভাস্ত মনে ছায়াটা যেন আর একজন সঙ্গী মনে হোল। বোধ হয়, ওর মাথা খাবাপ হয়ে আসচে.... কারণ বেঘোর অবস্থায় ও কত বার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো....কতবার পরক্ষণের সচেতন মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝে নিজেকে সামলে নিলে।

সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? জ্বর হয়নি তো?...তাব মাথার মধ্যে ক্রমশঃ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। আলভারেজ

...হীরের খনি...পাহাড়, পাহাড়, বালির সমুদ্র...আন্তিলিও  
গান্ধী...কাল রাত্রে ঘুম হয়নি....আবার রাত আসচে, সে একটু  
ঘুমিয়ে নেবে।

কিসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা অদ্ভুত ধরনের  
শব্দ আসচে কোন্ দিক থেকে? কোন্ পরিচিত শব্দের মত  
নয়। কিসের শব্দ? কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসচে তাও  
বোঝা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ কাছে আসচে সেটা।

“ হঠাৎ আকাশের দিকে শঙ্করের চোখ পড়তেই সে অবাক  
হয়ে চেয়ে রইল...তার মাথার ওপর দিয়ে আকাশের পথে  
বিকট শব্দ কবে কি একটা জিনিস যাচ্ছে। ওই কি  
এরোপ্লেন? সে বইয়ে ছবি দেখেছে বটে।

এরোপ্লেন যখন ঠিক মাথার ওপর এল, শঙ্কর চীৎকার  
করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছেব ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু  
কিছুতেই পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। দেখতে  
দেখতে এরোপ্লেনখানা সুদূরে ভায়েলেটে রঙেব পল্ক্রগার  
পর্বতমালার মাথার ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আরও এরোপ্লেন যাবে এ পথ দিয়ে। কি আশ্চর্য্য  
দেখতে এরোপ্লেন জিনিসটা। ভারতবর্ষে থাকতে সে এক-  
খানাও দেখেনি।

শঙ্কর ভাবলে আগুন জালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে  
যথেষ্ট ধোঁয়া করবে। যদি আবার এ পথে যায়, পাইলটের  
দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে। একটা সুবিধে হয়েছে,

এরোপ্লেনের বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোন দিকে ভেগেচে।

সেদিন কাটল। দিন কেটে রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের দুর্ভোগ হোল শুরু। আবার গত রাত্রির পুনরাবৃত্তি। সেই কোয়োটের দল আবার এল। আগুনের চারিধারে তারা আবার তাকে ঘিরে বসলো। নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই দূর থেকে একবার দেখে গেল। গভীর রাত্রে আব একবার এল।

কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? আওয়াজ করতে ভরসা হয় না—টোটা মাত্র ছুটী বাকী। টোটা ফুরিয়ে গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। মরতে তো হবেই, তবে ছুঁদিন আগে আর পিছে; যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

কিন্তু আওয়াজ তাকে করতেই হোল। গভীর বাত্রে হয়েনাগুলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। তাবা আরও এগিয়ে সরে এসে তাকে চারি ধার থেকে ঘিরলে। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারলে আর ভয় পায় না।

একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—বসে বসেই ঢুলে পড়েছিল। পর মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেকড়ে বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে টিপে তার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েচে। ওর ভয় হোল; হয়তো ওটা ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়বে। ভয়ের চোটে একবার গুলি ছুড়লে, আর একবার শেষ রাত্রে দিকে ঠিক এ রকমই হোল। কোয়োটগুলোর

ধৈর্য্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে মাত্র, কিছু বলে না ।  
কিন্তু নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খুঁজ চে ।

রাত ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়ে  
গেল কোয়োট, হয়েনা ও নেকড়ের দল । সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও  
আগুনের ধারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো ।

একটা কিসের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল ।

খানিকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো  
কিছুব । শঙ্করের কাণে তার রেশ এখনও লেগে আছে ।

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেছে ? কিন্তু তা অসম্ভব ।  
এই দুর্গম পর্বতের পথে কোন্ মানুষ আসবে ?

একটা মাত্র টোটা অবশিষ্ট আছে । শঙ্কর ভাগ্যেব ওপব  
নির্ভর কবে, সেটা খবচ কবে একটা অওয়াজ করলে । যা  
থাকে কপালে, মবেচেই তো । উত্তরে ছ'বার বন্দুকের আওয়াজ  
হোল ।

আনন্দে ও উত্তেজনায শঙ্কর ভুলে গেল যে তার পা খোঁড়া,  
ভুলে গেল যে সে একটানা বেশীদূরে যেতে পারে না । তাব  
আব টোটা নেই—সে আব বন্দুকের আওয়াজ করতে পারলে  
না—কিন্তু প্রাণপণে চীৎকার কবতে লাগলো, গাছেব ডাল  
ভেঙে নাড়তে লাগলো, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোব সন্ধানে  
চাবিদিকে আকুল-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলো ।

\*

\*

\*

\*

ত্রুগার শ্মশান পার্ক জরীপ করবার দল, কিম্বাণি থেকে



কেপ টাউন যাবার পথে, চিমানিমানি পর্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা ডবল টায়ার ক্যাটারপিলার চাকা বসানো মোটর গাড়ী। এদের দলে নিগ্রো কুলী ও চাকর বাকর বাদে ন' জন ইউরোপীয়। জন চারেক হরিণ শিকার করতে উঠেছিল চিমানিমানি পর্বতের প্রথম ও নিম্নতম থাকটাতে।

ইঠাৎ এ জনহীন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজে ওরা বিস্মিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওদের পুনরায় আওয়াজের প্রত্যুত্তর না পেয়ে ইতস্ততঃ খুঁজতে বেরিয়ে দেখতে পেল, সামনের একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চূড়া থেকে, এক জীর্ণ ও কঙ্কালসার কোটরগতচক্ষু প্রেতমূর্তি উন্মাদের মত হাত পা নেড়ে তাদের কি বোঝাবার চেষ্টা করচে। তাব পরণে ছিন্নভিন্ন অতি মলিন ইউরোপীয় পরিচ্ছদ।

ওরা ছুটে গেল। শঙ্কর আবোল তাবোল কি বকলে, ওরা ভাল বুঝতে পারলে না। যত্ন করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের নীচে ওদের ক্যাম্প নিয়ে গেল। ওর জিনিসপত্রও নামিয়ে আনা হয়েছিল। তখন ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোল।

কিন্তু এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হোল। ক্রমাগত অনাহারে, কষ্টে, উদ্বেগে, অথাত্ব কুথাত্ব ভঙ্কণের ফলে, তার শরীর খুব জখম হয়েছিল—সেই রাত্রেই তার বেজায় জ্বর এল।

\* \* \* \*

\* \* \*

জ্বৰে সে অঘোৰ অটৈতন্ত্ৰ হয়ে পড়লো—কখন যে মোটৰ গাড়ী ওখান থেকে ছাড়লো, কখন যে তাৰা সলস্বেৰীতে পৌছলো, শঙ্কৰেৰ কিছু খেয়াল নেই। সেই অবস্থায় পনেবো দিন সে সলস্বেৰীৰ হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে। তাৰপৰ ক্ৰমশঃ সুস্থ হয়ে মাসখানেক পৰে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইৰেৰ বাজপথে এসে দাঁড়ালো।



## চোদ্দ

সল্‌স্বেরি ! কত দিনের স্বপ্ন ! ...

আজ সে সত্যিই একটা বড় ইউরোপীয় ধরণের সহবেব ফুটপথে দাঁড়িয়ে। বড় বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক, হোটেল, দোকান, পিচ্ঢ়ালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম চলেচে, জুলু রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানচে, কাগজওয়ালা কাগজ বিক্রী করচে। সবই যেন নতুন, যেন এ সব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখেনি।

লোকালয়ে তো এসেচে, কিন্তু সে একেবারে কপর্দকশূন্য। এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তাব নেই। কাছে একটা ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হোল। কতদিন যে দেখেনি স্বদেশবাসীর মুখ ! দোকানদার মেমন মুসলমান, সাবান ও গন্ধদ্রব্যের পাইকারী বিক্রেতা। খুব বড় দোকান। শঙ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ উঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত। নিজে ছ' টাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগবেব সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলে।

টাকা ছুটী পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় বলে এল—অসীম ধন্যবাদ টাকা ছুটীর জন্যে, এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমার হাতে পয়সা এলে আপনাকে কিন্তু এ টাকা নিতে হবে। সামনেই একটা

ভারতীয় রেষ্টুরেন্ট। সে ভাল কিছু খাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। কতদিন সভা খাওয়া মুখে দেয়নি। সেখানে ঢুকে এক টাকার পুরী, কচুরী, হালুয়া, মাংসের চপ, কেব্ পেট ভরে খেলে। সেই সঙ্গে দু'তিন পেয়ালা কফি।

চায়ের টেবিলে একথানা পুরো ৥ খবরের কাগজের দিকে তার নজর পড়লো। তাতে একটা জায়গায় বড় বড় অক্ষরের হেড্ লাইনে লেখা আছে :—

National Park Survey Party's Singular Experience  
A lonely Indian found in the desert  
Dying of thirst and Exhaustion  
His strange story

শঙ্কর দেখলে, তাব একটা ফটোও কাগজে ছাপা হয়েছে। তার মুখে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পও দেওয়া হয়েছে। এরকম গল্প সে কারো কাছে করে নি।

খবরের কাগজখানাব নাম 'সল্‌স্‌বেরী ডেলি ক্রনিক্ল্'। সে খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে। তার চারিপাশে ভিড় জমে গেল। ওকে খুঁজে বার করবার জন্তে রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল। সেখানে চিমনিমানি পর্বতে পা-ভেঙ্গে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো তুলতে দিয়ে শঙ্কর পঞ্চাশ টাকা পেলেন। ও থেকে সে আগে সেই সন্তদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটী দিয়ে এল।

ওদের দৃষ্ট আগ্নেয়গিরিটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা

প্রবন্ধ লিখলে। তাতে আগ্নেয়গিরিটার ও নামকরণ করলে মাউন্ট আলভারেজ। তবে মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে লুকানো একটা এত বড় আস্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরির এই গল্প কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে না। অবিশিষ্ট রত্নের গুহার বাষ্পও সে কাউকে জানতে দেয় নি। দিলে দলে দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে।

তারপরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে সে এক রাশ ইংরেজী বই ও মাসিক পত্রিকা কিনলে। বই পড়েনি কতকাল! সন্ধ্যায় একটা সিনেমায় ছবি দেখলে। কতকাল পরে রাত্রে হোটেলের ভাল বিছানায় ইলেক্ট্রিক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে সে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নীচের প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর স্ট্রীটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ড্রাম যাচ্ছে নীচে দিয়ে, জুলু রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয় কফিখানায় ঠুনঠুন কবে ঘণ্টা বাজছে, মাঝে মাঝে ছ' চাবখানা মোটরও যাচ্ছে।...এব সঙ্গে মনে হোল আর একটা ছবি—সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদূরে বড়াকাবে ঘিবে বসে আছে কোয়োট ও হায়েনার দল। ওদের পিছনে নেকড়ে-টার ছোটো গোল গোল চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে, অন্ধকারের মধ্যে।

কোনটা স্বপ্ন?...চিমানিমানি পর্বতে যাপিত সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, না আজকার এই রাত্রি?

ইতিমধ্যে সলস্বেরীতে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে

গেল। রিপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল সব সময় ভর্তি। খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপাবার কণ্ট্রাক্ট করতে, কেউ আসে ফটো নিতে।

আন্তিলিও গান্ভির কথা সে ইটালিয়ান কনসাল্ জেনারেলকে জানালে। তাঁর আপিসের পুরোণো কাগজপত্র খেঁটে জানা গেল, আন্তিলিও গান্ভি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান যুবক ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে পর্টুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে জাহাজ ডুবি হবার পরে নামে। তারপর যুবকটির আর কোনো পাত্রা পাওয়া যায় নি। তার আত্মীয় স্বজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধানের জন্তে পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার কনসুলেট আপিসকে জ্বালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করাও হয়েছিল তার সন্ধানের জন্তে। ১৮৯৫ সাল থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

পূর্বোক্ত মুসলমান দোকানদারটির সাহায্যে সে ব্ল্যাকমুন ষ্ট্রিটের বড় জহুরী রাইডাল ও মর্সবিব দোকানে চারখানা পাথর সাড়ে বত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রী করলে। বাকী দু'খানার দর আরও বেশী উঠেছিল, কিন্তু শঙ্কর সে দু'খানা পাথর তার মাকে দেখাবার জন্তে দেশে নিয়ে গেতে চায়। এখন বিক্রী করতে তার ইচ্ছে নেই।

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

নীল সমুদ্র !.....

বন্থগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে পটু'গীজ পূর্ব আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারিকেলবনশ্রাম তীরভূমিকে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে, শঙ্কর ভাবছিল তার জীবনের এই এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা। এই তো জীবন, এই ভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু মানুষের জীবনের ভুল মাপকাটি। দশবৎসরের জীবন উপভোগ করেছে সে এই দেড় বছরে। আজ সে শুধু একজন ভবঘুরে পথিক নয়, একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ-আবিষ্কারক। মাউন্ট আল্‌ভারেজকে সে জগতে প্রসিদ্ধ করবে। দূরে ভারত মহাসমুদ্রের পারে জননী জন্মভূমি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের জন্ম এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মনটা উৎসুক হয়ে আছে, কবে দূর থেকে দৃশ্যমান বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চূড়োটা মাতৃভূমির উপকূলের সান্নিধ্য ঘোষণা করবে....তারপর বাউলকীর্তনগান মুখরিত বাংলাদেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল ছোটপল্লী....সামনে আসচে বসন্ত কাল....পল্লীপথে যখন একদিন সজ্জে ফুলের দল পথ বিছিয়ে পড়ে থাকবে, বৌ-কথা-ক ডাকবে ওদের বড় বকুল গাছটায়....নদীর ঘাটে গিয়ে লাগবে ওর ডিঙি।

বিদায় ! আলভারেজ বন্ধু !....স্বদেশে ফিরে যাওয়ার এই আনন্দের মূহুর্তে তোমার কথাই আজ মনে হচ্ছে। তুমি সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা পৃথিবী যাদের পায়ে চলার পথ—আশীর্ব্বাদ কোরো তোমার মহারণ্যের

নির্জ্জন সমাধি থেকে, যেন তোমার মত হতে পারি জীবনে, অমনি সুখ-দুঃখে নিম্প্রহ, অমনি নির্ভীক ।

বিদায় বন্ধু আভিলিঙ গান্ধি । অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি ।

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চীন দেশে প্রচলিত সেই প্রাচীন ছড়াটির সত্যতা—

\* ছাদের আলসের দিব্যি চৌরস একথানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো ।

\*

\*

\*

\*

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে । এখন জন্মভূমির টান বড় টান । জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে । তাবপর দেশেই সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে— আবার স্তূর রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্ব্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই ।

ততদিন—বিদায় !

—শেষ—



## পরিশিষ্ট

সন্স্বেরি থাকতে সে সাউথ রোডেসিয়ান মিউজিয়ামেব  
কিউরেটর প্রসিদ্ধ জবতব্রবিদ্ ডাঃ ফিট্জেরাল্ডের সঙ্গে দেখা  
করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জ্ঞো ।  
দেশে আসবার কিছুদিন পবে ডাঃ ফিট্জেরাল্ডএর কাছ থেকে  
শঙ্কব নিম্নলিখিত পত্রখানা পায় ।

The South Rhodesian Museum  
Salisbury, Rhodesia  
South Africa  
January 12, 1911

Dear Mr. Choudhuri

I am writing this letter to fulfil my promise to you  
to let you know what I thought about your report of a  
strange three-toed monster in the wilds of the  
Richtersveldt Mountains. On looking up my files I  
find other similar accounts by explorers who had been  
to the region before you, specially by Sir Robert Mc  
Culloch, the famous naturalist, whose report has not  
yet been published, owing to his sudden and untimely  
death last year. On thinking the matter over, I am  
inclined to believe that the monster you saw was

nothing more than a species of anthropoid ape, closely related to the gorilla, but much bigger in size and more savage than the specimens found in the Ruwenzori and Virunga Mountains. This species is becoming rarer and rarer every day, and such numbers as do exist are not easily to be got at on account of their shyness and the habit of hiding themselves in the depths of the high-altitude rain forests of the Richtersveldt. It is only the very fortunate traveller who gets glimpses of them, and I should think that in meeting them he runs risks proportionate to his good luck.

Congratulating you on both your luck and pluck:

I remain  
Yours Sincerely  
J. G. Fitzgerald

---